তবলার ইতিবৃত্ত

[সর্বভারতে মান্য সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রারম্ভিক হতে ষষ্ঠ বর্ষ এবং তদোর্ধ্ব পাঠক্রম উপযোগী]

●

শম্ভু নাথ ঘোষ

এম. এ (ডবল), বি.টি, কাব্যতীর্থ,
কাব্যরত্ন, সংগীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ),
সংগীত প্রভাকর (বাদ্য), এলাহাবাদ।

অধ্যক্ষ : গীতিগুঞ্জ, কলিকাতা ; সংগীতা, যাদবপুর।
প্রাক্তন : " : শরৎচন্দ্র পাল গার্লস স্কুল (ডান্স এণ্ড মিউজিক), কলিকাতা।
" " : যাদবপুর সংগীত মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।
" অধ্যাপক : রামকৃষ্ণ মিউজিক কলেজ, কলিকাতা।
" " : পঃ নবদ্বীপ ব্রজবাসী সংগীত মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।
পরীক্ষক : প্রাচীন কলাকেন্দ্র, চণ্ডীগড়।
" : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
" : প্রয়াগ সংগীত সমিতি, এলাহাবাদ।
" : সুরের মায়া সংগীত সমাজ, কলিকাতা।
সদস্য : বোর্ড অফ্ ষ্টাডিজ, প্রাচীন কলাকেন্দ্র।

●

গান্ধার প্রকাশনী

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
লিলি লজ, কলিকাতা-৭০০ ০১২

TABLAR ITIBRITTA

প্রকাশিকা :
অনিন্দিতা ঘোষ
১৬৬, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
লিলি লজ, কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ :
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫২
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৯

পঞ্চম সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ১৯৬০
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

মুদ্রক :
নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
১৪, দুর্গা পিথুরী লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

পরিবেশক :
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

পনের টাকা

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

গ্রন্থ পরিচিতি

সংগীতের নানা শাখা সম্বন্ধে বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় পুস্তকাদির অভাব নেই এবং এই বিষয়ে বোধহয় কণ্ঠসংগীতের প্রাধান্যই সর্বাধিক। বাদ্যযন্ত্রাদি বিষয়ে কিছু কিছু পুস্তক থাকলেও আনদ্ধ বা অবনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে মৃদঙ্গ ও তবলাই বর্তমানে সমধিক প্রচলিত। এই দুইটি বাদ্যের মধ্যে আবার তবলার প্রাধান্য তথা জনপ্রিয়তা খুব বেশি। কারণ কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে গীত, বাদ্যে এবং নৃত্যে তবলা-সঙ্গত অপরিহার্য। পাশ্চাত্য সংগীত অপেক্ষা ভারতীয় সংগীতে তালের জটিলতা অনেক বেশি একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাই তবলার আবিষ্কার ভারতীয় সংগীতের অগ্রগতির পথে এক নতুন পদক্ষেপ। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সংগীত জগতে ভারতের এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি অবাক বিস্ময় ও ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য।

বর্তমানে তবলার চর্চা ক্রমপ্রসারমান। তাছাড়া স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের মধ্যেও তবলা নিজের একটি আসন করে নিয়েছে। কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ হয় না যদি ক্রিয়াত্মক (Practical) অংশের সঙ্গে সেই বিষয়ের ঔপপত্তিক (Theory) অংশের সম্যক জ্ঞান না থাকে। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দুটিকেই সমান প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সংগীত বিদ্যাটাই গুরুমুখী, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠে কিছু হয় না,— বিশেষ করে ক্রিয়াত্মক অংশ। তবে ঔপপত্তিক অংশে জ্ঞানলাভের জন্য পুস্তকাদির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এতদিন তবলার এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে এবং সত্যকারের কোন ভাল পুস্তকের অভাবই বোধ করেছি। "তবলার ইতিবৃত্ত" সেই অভাব বহুলাংশে পূরণ করবে বলে মনে করি। মোটামুটি তবলা সংক্রান্ত সকল বিষয়ই পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে এবং আলোচনাগুলিও সাবলীল ও যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ হয়েছে। তবলা-শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানান্বেষী সকলেই এই পুস্তকপাঠে সবিশেষ উপকৃত হবেন।

১৬৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৮

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পুরোভাষ ॥

প্রথম সংস্করণ

আমার সংগীত জীবনের উষালগ্নে তবলা নিয়েই প্রথম পদচারণা। তাই তবলা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান আহরণের সচেষ্ট প্রয়াসের ফলশ্রুতি স্বরূপ 'তবলার ইতিবৃত্তের' কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ। প্রধানতঃ সকল সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়কে একদিকে যেমন যথাসম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে অপরদিকে তেমনই তবলা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় যারা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই অশীতিপর বয়স্ক জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীতকোবিদ ডঃ বিমল রায়ের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করতে হয়। "পুস্তক পরিচিতি" লিখে দেওয়া ব্যতীত নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে কেশববাবু সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ঘরাণার উদাহরণগুলিও তাঁর উদার দাক্ষিণ্যের নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। ডঃ রায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা "পখাবজ ও তবলার বিকাশ" গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে অন্যান্য যারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন তারা হচ্ছেন কোলকাতার সম্ভ্রান্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী সর্বশ্রী এস. চন্দ্র এবং কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন।

অলমিতি বিস্তারেণ।

কলিকাতা — গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণ

গ্রন্থটির উৎকর্ষতার জন্য প্রতি সংস্করণেই কিছু সংযোজন ঘটছে। এই সংস্করণটিও তার ব্যতিক্রম নয়, অর্থাৎ এবারে কয়েকটি কীর্তনাঙ্গ তাল এবং সমান মাত্রাসংখ্যাসম্পন্ন তালের মধ্যে তুলনা দেওয়া হয়েছে। আশা করি গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকবে।

কলিকাতা — গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পখাবজ ও তবলার বিকাশ (ডঃ বিমল রায়, এম. বি.)

প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতে পখাবজ ও তবলার নাম নেই। অথচ প্রচলিত মতে পখাবজ ও মৃদঙ্গে কোন পার্থক্য স্বীকার করা যায় না, যদিও তবলা ব্যাপারে নানা মত-বিভিন্নতা বর্তমান। আধুনিক গবেষণামুখী মন কিন্তু ঐ দায়বিহীন মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনা; সে বস্তুনিষ্ঠ হতে চায়। সেই বস্তুনিষ্ঠাই পখাবজ-কে মৃদঙ্গ থেকে পৃথক করে তোলে, তবলার ব্যাপারে একটি মতকে গ্রহণ করে।

পৌরাণিক যুগে মৃদঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়, বৈদিক যুগে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু সেই মৃদঙ্গের আকৃতি সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা পুরাণে নেই! আকৃতি ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান হলো নাট্যশাস্ত্রের ভরতের কালে। সে-সময়ের মৃদঙ্গ তিনটির মধ্যে যেটি ক্রোড়ে স্থাপন করে বাজানো হতো, সেটি হরিতকী আকৃতির, অর্থাৎ অনেকটা আধুনিক পখাবজের মতো দেখতে ছিল। কিন্তু সেই মৃদঙ্গে গাব দেওয়া হতো না, এমন কি মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। মৃত্তিকানির্মিত এই মৃদঙ্গ ভরতমুনির সময়ে আঙ্কিক নাম ধারণ করে এবং স্বাতীর প্রভাবে কালোমাটীর গাবযুক্ত হয়ে ও ছোটের টানের বাড়া-কমার ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে সেই আঙ্কিক সপ্তকের স্বর অনুসরণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। স্বরানু-করণের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে স্বাতি মৃদঙ্গে তিনটি প্রকারের নাম-করণ করেন-ত্রিপুষ্কর বা পুষ্করত্রয়। শার্ঙ্গদেবের সময়ে পুষ্কর নামটি লোপ পায়, মৃদঙ্গ নাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মর্দল শব্দটি মৃদঙ্গের

সমর্থক রূপে প্রচলিত হয়। মুরজ বাদ্যটিও তার রূপ পরিবর্তন করে মৃদঙ্গ বিশেষ হয়ে পড়ে। কিন্তু পুষ্করত্রয়ের ঊর্ধ্বক, আলিঙ্গ্য লুপ্ত হয়ে যায় নিঃশেষে, কাজেই মৃদঙ্গ বলতে এ সময়ে আঙ্কিক বাদ্যকেই বোঝায়। পার্থক্য এইটুকু হয় যে, আঙ্কিকের মুখদুটি যেখানে ১২ আঙ্গুল, সেখানে মর্দলের দুমুখ ১৩ এবং ১৪ আঙ্গুল। ঐ দুমুখের বামুখে গাব লাগানো হতো বেশী করে। তা ছাড়া মর্দলে ছোটের সঙ্গে দড়ির রিং থাকতো, যার সাহায্যে স্বর চড়ানো নামানো যেতো; আজকাল রিং-এর বদলে কাঠের গুলি হয়েছে। অন্য পার্থক্য হলো, পুষ্কর ছিল মাটীর তৈরী, মর্দলের দেহ ছিল কাঠের। এই মর্দল বা মৃদঙ্গের নাম পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এ নাম খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও আকৃতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও স্পষ্টভাবে মেলে না। অথচ মুসলিম প্রভাবিত অভিজাত সঙ্গীতে মৃদঙ্গ নামের পরিবর্তে পখাবজ নামটির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই পখাবজ শব্দটির উদ্ভব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু জৈন সুধীকলশ সে কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। সুধীকলশ বাচনাচার্য্য ১৪শ শতকের মধ্যকাল থেকে ১৫শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ কালের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। এই জৈন পণ্ডিত ছিলেন অভয়চন্দ্র সূরির শিষ্য-পরম্পরাগত সঙ্গীতজ্ঞানী এবং সেই সূত্রে পার্শ্বদেবের কৌলিন্যে বর্ধিত। "সঙ্গীতোপনিষৎসারোদ্ধার" নামক গ্রন্থ এই সুধাকলশ কর্তৃক রচিত একখানি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক, যা প্রাচীন জৈন মতের ধারক এবং সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত।

গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে, অতএব সাধারণের পক্ষে সহজ-লভ্য এই গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় সুধীকলশ কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"তাউজা লোকভাষায়াং থল্লাউজ-পখাউজো
মতাঃ পট্টাউজশ্চেতি স্ব স্ব-নামানুসারিণঃ।
তথৈব ম্লেচ্ছবাদ্যানি ঢোল্ল তবলমুখানি তু
ডফা চ টামকীচৈব ডউণ্ডিঃ পাদবারণম……

এই একমাত্র জ্ঞানী যিনি জানিয়েছেন, তাঁর সময়ে বা তার আগে থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে পখাউজ ও তবল ব্যবহৃত হত। পখাউজ পখ-আবজের্ লোকভাষা এবং তবল একটি ম্লেচ্ছবাদ্য।

আবজ ভারতীয় প্রাচীনবাদ্য। সঙ্গীত রত্নাকরে আছে :—

১। "দেশীপটহম্ এবাহুর ইমম্ অড্ডাবজং জনাঃ" ৬।৮২৪

২। হুড়ুক্কা সা বুধৈঃ প্রোক্তা…৫. ৬।১০

সক্ষ্যজ্ঞানস্তারজং প্রাহুর্ ইমাং স্কন্ধাব্জং তথা" ৬।১০

অর্থাৎ শার্ঙ্গদেবের সময়ে আব্জ (হুড়ুক্কা), স্কন্ধাবজ। হুড়ুক্কা); অড্ডাবজ (দেশী পটহ) বাদ্যের নাম ও ব্যবহার পাওয়া যায়। কিছুকালের মধ্যেই দেশী উচ্চারণে এগুলি হয়ে পড়ে আউজ, খন্দাউজ, পট্রাউজ [অড্ড শব্দটি উত্তর ভারতে পট বা আড়া এবং দক্ষিণ-ভারতে আটরূপে বিবর্তিত হয়েছিল, প্রমাণ—অড্ডতাল=পটতাল=অটতাল]। সেই সময় পখাউজ নামে একটি নতুন বাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মনে হয়, পখাউজ শব্দটি এসেছিল পুষ্করাব্জ থেকে [পুষ্কর=পুখ্খর্; পুখ্খর+আব্জপুখ্খরাব্জ=পুখ্খাব্জ=পখাবজ=পখাউজ]। পুষ্কর ও আব্জ দুটি পৃথক শ্রেণীর বাদ্য। পুষ্কর মৃদঙ্গ শ্রেণীর বাদ্য যার চর্মাবরণে খিরণ লাগানো হত, যে জন্য পুষ্করে সপ্তকের স্বর উৎপাদন সম্ভব ছিল। তার আকৃতিও ছিল আধুনিক পখাব্জের মতো এবং বাম মুখ দক্ষিণ মুখ অপেক্ষা সামান্য বড় বা সমান ছিল। অপরপক্ষে আব্জ আকৃতিতে ছিল অনেকাংশে ঢোলের মতো, চর্মাবরণে গাব দেওয়া ছিল না এবং দক্ষিণ মুখ বাম মুখের সমান বা তুলনায় সামান্য বড় ছিল।

পুষ্কর হাতে বাজানো হত, আব্জ বাজতো দণ্ড-সাহায্যে বা দণ্ড ও হাতের মিলিত ব্যবহারে। অনুমান করা যায়, ১৪শ শতকে কোন গুণী আবজকে পুষ্কর আকৃতি করে পখাবজ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে বাদ্যটির মধ্যদেশ কিছু স্থূল হয়েছিল, দক্ষিণ-মুখ বাম মুখের চেয়ে ছোট হয়েছিল, কিন্তু যার চর্মাবরণ ও বাদন পদ্ধতি আবজের অনুরূপ রাখা হয়েছিল। অতঃপর বিবর্তনের প্রভাবে পখাবজে গাবের প্রচলন হয় এবং হস্ত বাদন পদ্ধতি গৃহীত হয়।

এ সময়ে তবলা গীতবাদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বোধহয়, ঐ তবলার অনুকরণে পখাবজে খিরণ বা গাবের আরণিক প্রকৃতির অনুলেপন সুরু হয়—ডান মুখে পুরু গাব ব্যবহার করা হয়, বাঁ মুখ সাদা থাকে।

মনে হয় পখাবজের অনুকরণে একদিন পুষ্কর বা মৃদঙ্গও আকৃতি প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে পখাবজের সমর্থক হয়ে পড়ে এবং শেষে পখাবজ মৃদঙ্গেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তনটি হয়েছিল উত্তর ভারতে, কারণ তবলা উত্তর ভারতেই প্রচারিত ছিল, দক্ষিণ ভারতে নয়। তাই দক্ষিণে আজও মর্দলম্ বাজে, পখাবজ চলে না।

পখাবজের নামের সঙ্গে তবলা এমনভাবে জড়িত যে তবলার ইতিহাস না জানলে পখাবজ সম্বন্ধে জ্ঞান খণ্ডিত হয়ে পড়বে। তবলা না থাকলে আবজের বৃহত্তর দক্ষিণ মুখ ছোট হত না এবং পুষ্করের বাম মুখের পুরু গাব উঠে গিয়ে দক্ষিণ মুখের পাতলা গাব পুরু প্রলেপ পেয়ে বিস্তৃত হয়ে শব্দে বিচিত্রতা আনতে পারতো না।

সুধাকলশ বলেছেন, তবল অর্থাৎ তবলা ম্লেচ্ছ-বাদ্য। ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে ম্লেচ্ছ বলতে মুসলিমদের বোঝাতো, সুতরাং তবলা মুসলিমদের দ্বারাই ভারতে আনিত হয়েছিল। কিন্তু এ আনয়নের কোন ঐতিহাসিক বা লিপিবদ্ধ প্রমাণ নেই। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রমাণ বহু কারণে লোপ পেতে পারে। এমনও হতে পারে, তবলা খ্যাল—গজলের সঙ্গে বাজানো হত বলে ভারতীয়রা এ বাদ্যকে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেন নি। সে যাইহোক, 'সঙ্গীতোপনিষৎসার' অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করেছে যে, তবলা ১৯শ খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই এ দেশে আছে। নামটির মধ্যেই আরবদেশীয় ঐতিহ্য সপ্রমাণ হয়ে রয়েছে। অধিকন্তু, তবলা-বাঁয়ার মত কোনও বাদ্য আমাদের দেশে ছিল না। ভরতকালীন উর্ধ্বক ছিল যবাকৃতি, বামক, দক্ষিণ ছিল আঙ্কিক মৃদঙ্গের দুটি মুখ; দদুর ছিল ঘণ্টাকৃতি যার মুখ ছিল ঘটের মতো। ১২শ শতকে এরা ব্যবহৃত হত এমন প্রমাণও কোথাও নেই। অথচ আরবীয় বাদ্য যে ৬শ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জোড়ায় জোড়ায় বাজানো হত তার প্রমাণ মেলে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি থেকে।

আরবদেশে চর্মবাদ্য বলতে নক্কারাকেও যেমন বোঝাত, তেমন বোঝাতো তবলকে। এই দুইটি বাদ্য বিভিন্ন সময়ে ইয়ুরোপে গিয়েছিল কিছুটা গঠনমূলক পার্থক্য নিয়ে এবং নাম পেয়েছিল যথাক্রমে নকেয়র্স ও তিঁব্যাল। ইতালীতে তিঁব্যালকে বলা হত তিঁপানি। তিঁপানির যে ছবি আমরা 'মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেণ্টস্ থ্রু দি এজেস্' গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় দেখি, তা থেকে স্পষ্ট ধারণা হয়, আরবীয় তবল বলতে এক জোড়া ছোট-বড় বাঁয়াকে বোঝাতো, যারা দাঁড় করানো, যাদের একটিই মুখ—যে মুখ চর্মের আবরণ দেওয়া; এই চর্মকে টেনে বেঁধে বিভিন্ন স্বর বহির্গত করবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এতে খিরণ ব্যবহার বোধ হয় ছিল না। তাবর নামক আর একটি বাদ্য ১৩শ শতকে পশ্চিম ভূখণ্ডে পৌঁছেছিল, যার আকৃতি ছিল তবলার ডাহিনাটির ছোট সংস্করণ। নক্কারার বড় আকার যে-দুটি সে দুটির আকৃতি ডিমের মতো ছিল।

এই সব আকৃতির বিবর্তনের কথা চিন্তা করলে ১২শ খ্রীষ্টাব্দের তবলা বাঁয়াকে আধুনিক তবলা-বাঁয়ার পূর্বতন রূপ বলে ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না।

আরবীর এই তবল যেমন ১৩শ শতকে পশ্চিম গোলার্ধে পৌঁছেছিল তেমন এই বাদ্যটি আরবীয় বিজেতাদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল, এ ধারণা বোধহয় মিথ্যা নয়। 'সঙ্গীতোপনিষৎসার' খুব সম্ভব এই ইঙ্গিতই দেয়। কিন্তু নক্কারা, তবল, খোরদক্ প্রভৃতিতে গাব ছিল না, সুতরাং তবলার একটি বিরাট বিবর্তন ঘটেছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ১৪শ শতকে পখাবজ প্রচলিত আছে, অতএব মৃদঙ্গের খিরণ প্রয়োগ ঐ যন্ত্রে দেখা দিয়েছে। তবলার ডাইনার খিরণ অনুকরণ করতে গেলে মেনে নিতে হয় যে, ১৪শ শতকের মধ্যেই তবলার গাবের ব্যবহার এসেছিল। গাবহীন ঢোল তখন প্রচলিত বা ঢক্কের স্থান গ্রহণ করছে, অথচ গজল, কৌল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতের উপযুক্ত মৃদুধ্বনিযুক্ত বাদ্য নেই। এই অভাব মেটাবার জন্যই তবলে মৃদঙ্গের খিরণ দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু তবলার ডাহিনাটি বড় এবং যে-কোন কারণেই হোক্ প্রধান হওয়ার জন্য ধ্বনি উৎপাদন ব্যাপারে তার বৈচিত্র্য বোধহয় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এবং সেইজন্যই এমন-

ভাবে খিরণ লেপন করা হয়েছিল যাতে ধ্বনিটি সূক্ষ্ম, মধুর অনুকরণযুক্ত হয়। এই কারণেই ডাহিনার গাব ছিল পুরু, বিস্তৃত, যার ফলে লব বা ময়দান অংশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। বাঁয়ার প্রলেপটি খুবই পাতলা পুড়ীর মধ্যস্থলে না হয়ে কিনারার দিকে সরানো। প্রলেপের এই বৈশিষ্ট্য মৃদঙ্গে ছিল না, পখাবজে আজও নেই। বাঁয়ার ধ্বনিবৈচিত্র্য পখাবজের বামুখ থেকে সৃষ্টি করা অসম্ভব।

এই বিচিত্র তবলা তখনই প্রাধান্য লাভ করেছিল যখন গজল, খ্যাল দরবারে ভালভাবে স্থান পেয়েছিল। সে ব্যাপার ঘটেছিল ১৮শ শতকে। কিন্তু ১৫শ শতকেও কবীরের সময়ে তবলা বোধহয় সাধারণ গানের সঙ্গে বাজতো। একটি গান আছে, যাতে তবলা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে—

> "সারঙ্গ জলতরঙ্গ ধুনিধারী
> তবলা চহুঁ ওর নরসিংহ ডফারী।
> ইহ বিধি ভোর গুফা ধ্বনি গাজৈ
> নানা রঙ্গ মধুর ধ্বনি বাজৈ"॥

———

তবলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা

তবলার উৎপত্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে প্রচলিত অনুমানগুলির একটি সংক্ষেপিত সারাংশ নিম্নে দেওয়া হল :

ক) আরব দেশে প্রচলিত চর্মবাদ্য 'তবল' থেকেই তবলার উৎপত্তি রয়েছে। বাদ্যকর জুবলের পুত্র টুবল দ্বারা যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে তারই নামানুসারে এর নাম হয় তবল।

খ) ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় পারস্য দেশীয় কবি আমীর খসরু এই যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন।

গ) পারস্য দেশেও 'তবল' নামে বর্তমানকালের নাকাড়ার অনুরূপ একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং পারস্যদেশীয় বাদ্যযন্ত্র 'তবল্'

হতেও তবলার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

ঘ) প্রাচীন যুগের তবলার অনুরূপ যন্ত্র 'ঊর্ধক' হতে তবলার সৃষ্টি হয়েছে।

ঙ) সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সদারঙ্গের শিষ্য দ্বিতীয় আমীর খসরুই তবলার উদ্ভাবক। এই আমীর খসরু ছিলেন মোগল বাদশাহ ২য় মহম্মদ শা'র সময়ে (১৭৩৮) রহমান খাঁ নামক বিখ্যাত পাখোয়াজীর পুত্র।

চ) দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ওস্তাদ সুধার খাঁ পাখোয়াজকে বিভক্ত করে তবলার সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন ভারতীয় অবনদ্ধ বাদ্য ও তার পরিচয়ঃ—চর্মাবৃত বাদ্য যন্ত্রটিকেই বলা হয় অবনদ্ধ বা আবদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে এবং তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল উত্তর-পূর্ব ভারতের পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ঢোল, নাকাড়া, দক্ষিণ ভারতের মৃদঙ্গম, তভিল, শুদ্ধ মঙ্গলম, ছেণ্ডা, উরুমি, পাম্বাই, উড়ুক্কু, কাশ্মীরের তুম্বকনরি, উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন গাড়োয়াল অঞ্চলের হুড়ুক, কেরলের তিমিলা ইত্যাদি। নিম্নে পাখোয়াজ এবং তবলা বাদে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

খোলঃ খোলের আর একটি নাম মৃদঙ্গ; কিন্তু পাখোয়াজ কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গমের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। খোলের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই তৈরী হয় পোড়া মাটি দিয়ে। এর দুই দিকে ঢালু, মধ্যস্থলের পরিধি স্ফীত। বাম এবং দক্ষিণ মুখ দুইটি চর্মাবৃত এবং মধ্যভাগ গাবযুক্ত। বাম মুখটি দক্ষিণ অপেক্ষা বৃহত্তর দুই মুখের চর্মাবরণ চামড়ার টানায় আঁটভাবে যুক্ত থাকে। খোলের দক্ষিণ মুখের পরিধি মাত্র ২।৩ ইঞ্চির বেশী হয় না এবং সুর অতি তারার কোন স্বরে থাকে। কিন্তু এর বাম মুখটিতে অনেকটা বাঁয়ার মতন শব্দ হয়। খোলের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে তবলার মত সুর বাঁধাবাঁধির ব্যাপার নেই। বাংলাদেশে প্রধানতঃ কীর্তন, ভক্তিসংগীত এবং কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত সহ অন্যান্য গানে খোল

ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম সহযোগী বাদ্য হচ্ছে খোল

ঢোল : ঢোলের কাঠামোটি হয় কাষ্ঠ নির্মিত এবং দুইটি মুখ চর্মাচ্ছাদিত থাকে। সাধারণতঃ এগুলির দৈর্ঘ্য হয় ১৮" থেকে ২০" এবং প্রস্থ হয় ১২" ইঞ্চি। এর দুই প্রান্ত মজবুত রজ্জু অথবা চর্মানির্মিত রজ্জুদ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই রজ্জুগুলি ছোট ছোট গোল রিং-এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রিংগুলি দুই প্রান্তের স্বর বাঁধবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ঢোল বা ঢোলক খালি হাত অথবা কাঠির সাহায্যেও বাজান হয়ে থাকে। সারা ভারতে লোকসংগীত অথবা পূজাপার্বণাদিতে ঢোল ব্যবহৃত হয়।

নাক্কাড়া : নাক্কাড়া বা নাগারা প্রাচীন অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অন্যতম। ভেরী বা দুন্দুভি বাদ্য যা সাধাধণতঃ রণবাদ্য হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছিল সেগুলি এই নাক্কাড়ারই প্রকারভেদ মাত্র। নাক্কাড়ার কাঠামো সাধারণতঃ তামা অথবা পিতলের হয়ে থাকে এবং এর আকৃতি হয় অনেকটা বাঁয়ার মত। বাঁয়ার মতই নাক্কাড়ার মুখ থাকে চর্মাবৃত এবং এর পরিধি হয় ২½ ফুট হতে ৩ ফুট। এর চর্মাবৃত অংশটি মোটা রজ্জু অথবা চর্মনির্মিত রজ্জুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। নাক্কাড়া বাজান হয় কাঠির সাহায্যে। তবে উত্তর ভারতে সানাইয়ের সঙ্গে কেবলমাত্র হাত দিয়েই নাক্কাড়া বাজান হয়ে থাকে।

মৃদঙ্গম : উত্তর ভারতে পাখোয়াজকেও মৃদঙ্গ বলা হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গমের সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে। মৃদঙ্গমের আকৃতি পাখোয়াজ থেকে কিছু ছোট হয়। তাছাড়া পাখোয়াজের বাম অংশ বাম হস্তের দ্বারা খোলাখুলি বাজান হয়, কিন্তু মৃদঙ্গমের বাম অংশ বাঁয়ার মত করে বাজান হয়। মৃদঙ্গমের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১½ ফুট হতে ২ ফুট হয়ে থাকে। উত্তর ভারতে তবলার মত দক্ষিণ ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতে মৃদঙ্গমই অন্যতম সহযোগী বাদ্যযন্ত্র।

তভিল: তভিলের আকৃতি অনেকটা ঢোলের মত। এর দক্ষিণ পার্শ্ব দক্ষিণ হস্ত এবং অঙ্গুলির সাহায্যে বাজান হয় এবং বাম পার্শ্ব একটি শক্ত কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে বাজান হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি দক্ষিণ ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

শুদ্ধ মড্ডলম :—দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গমের অনুরূপ বাদ্যযন্ত্র। তবে মৃদঙ্গম থেকে এর আকৃতি বড় হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বের চর্মাচ্ছাদনের উপর কৃষ্ণবর্ণ অংশটি মৃদঙ্গম্ অপেক্ষা বড় এবং বেশ পুরু হয়। সেইজন্য মৃদঙ্গম অপেক্ষা শুদ্ধ মড্ডলমের ধ্বনি অধিকতর গম্ভীর এবং উঁচু। কেরলের কথাকলি নৃত্যে এই বাদ্যযন্ত্রটি অপরিহার্য।

ছেণ্ডা : ছেণ্ডাও ঢোলের আর একটি প্রকারবিশেষ, দৈর্ঘ্য ২ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ১ ফুট। দুই হাতে দুটি কাষ্ঠখণ্ডের (Stick) দ্বারা ছেণ্ডা বাজান হয়। কথাকলি নৃত্য মড্ডলমের সহযোগী বাদ্য হিসাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাটকের লোকনৃত্যে ছেণ্ডা ব্যবহৃত হয়।

উরুমি : ঢোলকের মতই উরুমির উভয় পার্শ্ব চর্মাচ্ছাদিত এবং এর দুটি প্রসারিত মুখ মধ্যাংশের দিকে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা বক্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে চামড়ার উপর ঘসে এই যন্ত্রটি বাজান হয়।

পাম্বাই : প্রায় একফুট লম্বা পৃথক দুইটি ঢোলকে একত্রে বেঁধে পাম্বাই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরী করা হয়েছে। এর উর্ধাংশ তৈরী হয় ব্রাস দিয়ে ও নিম্নাংশ হয় কাষ্ঠ নির্মিত এবং উভয় পার্শ্বই চর্মাচ্ছাদিত থাকে। পাম্বাইয়ের দক্ষিণ দিক একটি বক্র কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা এবং বাম দিক কেবলমাত্র হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্যাদিতে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়।

উড়ুক্কু : প্রায় একফুট লম্বা, মাঝখানে সরু এবং দুই দিক চওড়া যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা আমাদের ডুগডুগির মত। এর কাঠামোটি তৈরী হয় মাটি বা কাষ্ঠ দ্বারা। উড়ুক্কু বাঁহাতে ধরে ডান হাতের অঙ্গুলির সাহায্যে বাজান হয়। তামিলনাড়ুর কোনও কোনও লোকসংগীতে উড়ুক্কু ব্যবহার করা হয়।

তুম্বকনরি : কাশ্মিরী ঢোলকে বলা হয় তুম্বকনরি। তবে এর আকৃতি জলপাত্রের মত দেখতে, যার উর্ধাংশ সরু। এর নিম্নাংশ চর্মাচ্ছাদিত। বামদিকের বগলে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে যন্ত্রটি বাজাতে হয়, অর্থাৎ আমাদের গুব্‌গুবির মতই যন্ত্রটি ধরতে হয়। কাশ্মীরের লোকসংগীতে তুম্বকনরি একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

হুড়ুক :—ডমরুর মত দেখতে, তবে আকৃতিতে বড়। এর উভয় পার্শ্বই চর্মাচ্ছাদিত এবং শক্ত রজ্জুদ্বারা সংযুক্ত থাকে। বাম স্কন্ধে ঝুলিয়ে নিয়ে ডান হাতের সাহায্যে হুড়ুক বাজান হয়। কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের পার্বত্য অঞ্চলের লোকসংগীতে হুড়ুক একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

তিমিলা :—ঢোলকেরই প্রকারভেদ মাত্র। বাম স্কন্ধে ঝুলিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র এর উর্ধাংশ দুই হাত দিয়ে বাজান হয়। কেরলের মন্দিরসমূহে ধর্মীয় সংগীতে তিমিলা ব্যবহৃত হয়

তবলা, বাঁয়া ও পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা

তবলা এবং বাঁয়ার নানা অংশ আছে এবং সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ডান হাতে বাজান হয় বলে তবলাকে অনেকে 'ডাহিনা' বলে থাকেন এবং বাঁয়াকে বলা হয় 'ডুগী'। নিম্নে তবলা, বাঁয়া এবং পাখোয়াজের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচয় দেওয়া হল।—

তবলার অঙ্গ

১) লকড়ী বা কাঠ তবলার মূল কাষ্ঠনির্মিত সমগ্র অংশটিকেই বলা হয় লকড়ী বা কাঠ।) এই অংশটি নির্মাণে নানা জাতের কাঠ ব্যবহার করতে দেখা যায়, যেমন—নিম, চন্দন, বিজয়শাল, আম, কাঁঠাল সীসম প্রভৃতি। এই অংশটির নিম্নভাগ এবং উপরিভাগ গোলাকৃতি; তবে নিম্নভাগটি উপরিভাগ হতে চওড়া হয়। নিম্নভাগের ব্যাস হয় সাধারণতঃ ৮"। ৯" ইঞ্চি এবং উপরিভাগের ব্যাস হয় ৫"।৬" ইঞ্চি। এই কাঠটির উচ্চতা হয় ৯" হতে ১২" পর্যন্ত। কাষ্ঠাংশের মধ্যস্থল ফাঁপা থাকে।

২) পুড়ী বা ছাউনি—কাঠের উপরস্থ চর্মাচ্ছাদিত গোলাকার অংশটির নাম পুড়ী বা ছাউনি। অংশটি নির্মাণে ছাগ বা মেষচর্ম ব্যবহার করা হয়। পুড়ী বা ছাউনিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: (ক) স্যাহী বা গাব, (খ) কানি বা চাঁটি এবং (গ) লব, সুর বা ময়দান।

ক) স্যাহী বা গাব—চর্মাচ্ছাদিত অংশের ঠিক মধ্যস্থলে কাল রঙের গোলাকার অংশটিকে বলা হয় স্যাহী বা গাব।

খ) কানি বা চাঁটি—ছাউনির কিনারা সংলগ্ন আধ ইঞ্চির মত বৃত্তাকার চর্মটিকে বলা হয় কানি বা চাঁটি।

গ) লব, সুর বা ময়দান - গাব এবং কানির মধ্যবর্তী অংশটির নাম লব, সুর বা ময়দান।

৩) গজরা বা পাগড়ী—১৬টি ছিদ্রযুক্ত চামড়ার যে মোটা অংশটি ছাউনিকে ঘিরে রাখে তাকে বলা হয় গজরা বা পাগড়ী।

৪) গুড়রী—কাঠের নিম্নাংশে চর্মনির্মিত গোলাকৃতি বস্তুটিকেই বলা হয় ইণ্ডবী বা গুড়রী।

৫) ছোট্, বদ্ধি বা ডোরী—ছাউনিকে শক্ত বাঁধনে বাঁধবার জন্য গজরা থেকে গুড়রী পর্যন্ত চর্মরজ্জুকে বলা হয় ছোট্, বদ্ধি বা ডোরী।

গুলি বা গট্টা—ছোটের নীচে কাঠের উপর যে ছোট ছোট আটটি কাঠের টুকরা থাকে সেইগুলিকে বলা হয় গুলি বা গট্টা।

বাঁয়ার অঙ্গ

তামা, পিতল অথবা মাটি দিয়ে বাঁয়ার অবয়ব তৈরী হয় এবং তাকে বলা হয় হাঁড়ি বা কুড়ী। বর্তমানে মাটির বাঁয়ার প্রচলনই বেশী। বাঁয়ার উচ্চতা হয় সাধারণত: ৮"/৯" ইঞ্চি এবং এর নিম্নভাগ হতে উপরিভাগের আয়তন বেশী। উপরিভাগের ব্যাস সাধারণত: ১০/১২ ইঞ্চির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাঁয়ার ভিতরের অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁপা থাকে।

তবলার মত বাঁয়ারও ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে, যেমন—কুড়ী, পুড়ী, চাঁটী, গজরা, গাব বা স্যাহী, লব বা ময়দান, ছোট্, গুড়রী ইত্যাদি। বাঁয়ার

গুলি বা গট্টা নেই। তবলার বর্ণিত অঙ্গগুলির মতই বাঁয়ার এই অঙ্গগুলি বলে আর পুনরুক্তি করা হল না। তবে তবলার সঙ্গে বাঁয়ার অঙ্গের নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখ্য :—

(ক) তবলার গাব বা স্যাহী থাকে ছাউনির ঠিক মধ্যস্থলে কিন্তু বাঁয়ার থাকে কিনারার দিকে।

(খ) তবলার গাবের অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ এর উপর নানা প্রকার বোল বাজান হয়ে থাকে, কিন্তু বাঁয়ার গাবের উপর কোন বোল বাজান হয় না।

(গ) তবলার গাবের অংশ বাঁয়ার থেকে বড় হয়।

পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা :

আকৃতি—তবলা এবং বাঁয়ার সংযুক্ত রূপের মতই অনেকটা পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গের আকৃতি। কাঠামোটি রক্তচন্দন, নিম, কাঁঠাল, খরিদ ইত্যাদি নানা জাতের কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। তবে খদির এবং রক্তচন্দন কাঠের পাখোয়াজই উত্তম বলে সর্বজনস্বীকৃত। তবলার মত অংশে তবলার মতই পাখোয়াজের পুঁড়ী, গাব. কানি, লব, গজরা ছোট্, গুলি প্রভৃতি অংশ আছে। পাখোয়াজ লম্বায় সাধারণতঃ ১′ ৯″ হতে ২′ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ডানদিকের মুখের পরিধি হয় ৬″ বা ৭″ ইঞ্চি, বামদিকের মুখের পরিধি ৭″ বা ৮″ ইঞ্চি এবং মধ্যস্থলের ব্যাস হয় ৯″ | ১০″ ইঞ্চি।

ছাউনি—পাখোয়াজের উভয় প্রান্তই চর্মাচ্ছাদিত। বাঁয়ার মত অংশে অর্থাৎ বামদিকের অংশের উপর বাজাবার পূর্বে বেশ পুরু করে আটা বা ময়দা লাগিয়ে নেওয়া হয়। মৃদঙ্গের আওয়াজকে প্রয়োজন-মত গুরু-গম্ভীর করবার জন্ত আটা বা ময়দা ব্যবহার করা হয়।

ছোট্ বা বদ্ধী—দুই প্রান্তস্থ ছাউনিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখবার জন্ত যে চর্মরজ্জু ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় ছোট্ বা বদ্ধী।

গজরা—ছাউনীর নিম্নে চর্মনির্মিত পাগড়ীর মত গোলাকার বস্তুটির নাম গজরা। এই গজরার সঙ্গেই ছোট্কে সংযুক্ত করা হয়।

গুলি—ছোটের নিম্নস্থ ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ডের নাম গুলি। গুলির সংখ্যা থাকে আটটি।

গাব
লব
কানি
গজরা
ছোট্
কুড়ী
গুড়রী
বাঁয়া
গাব
লেব
কানি
গজরা
কাঠ
ছোট্
গুলি
গুড়রী
তবলা
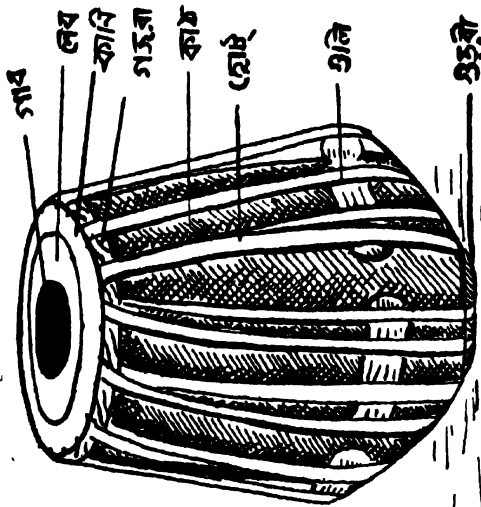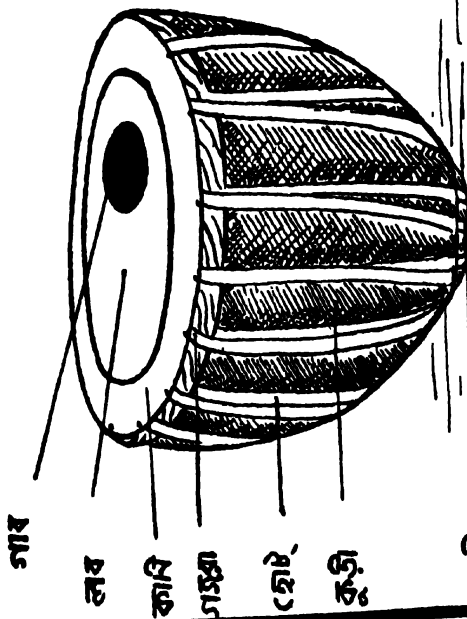
পাখোয়াজ

তবলা ও মৃদঙ্গের তুলনা

তবলা এবং মৃদঙ্গ দুইই অনবদ্ধ বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্য হলেও দুটি বাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন :

১) তবলায় অনেক পূর্বে মৃদঙ্গের উদ্ভব হয়েছে এবং পরবর্তী কালে মৃদঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আমীর খুস্‌রো তবলার উদ্ভাবন করেন বলে প্রবাদ আছে।

২) তবলা এবং মৃদঙ্গের গঠনপ্রণালী বা আকৃতিতে কোনও মিল নেই। তবলা ও বাঁয়া—পৃথক পৃথক অংশ, মৃদঙ্গের কোনও পৃথক অংশ নেই।

৩) মৃদঙ্গের ধ্বনি তবলার তুলনায় অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাই ধ্রুপদ, ধামার জাতীয় গানে তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গ উপযোগী।

৪) দুটি বাদ্যযন্ত্রের বাজাবার মধ্যেও পার্থক্য আছে। তবলা-বাঁয়া বাজাবার সময় উর্ধমুখী থাকে. কিন্তু মৃদঙ্গ শায়িতবস্থায় রাখতে হয় এবং এর মুখ দুইটি থাকে পার্শ্বে।

৫) তবলা ও মৃদঙ্গের বোল বা বাণীর মধ্যে পার্থক্য আছে এবং দুইটি বাদ্যযন্ত্রের বাদন-শৈলীও এক প্রকার নয়। তবলার বোলগুলি বাজান হয় দুই হস্তের অঙ্গুলীর সহায়তায়, কিন্তু মৃদঙ্গ বাজাতে হাতের পাঞ্জা ব্যবহার করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উভয় যন্ত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

৬) বর্তমান কালে তবলা মিলান হয় মধ্য সপ্তকের পঞ্চম বা তার ষড়জে ; কিন্তু মৃদঙ্গের স্থুর মিলান হয় মন্দ্র ষড়জে।

৭) ধ্রুপদ কিংবা ধ্রুপদাঙ্গের গান ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর সংগীতে সাধারণতঃ তবলা ব্যবহার করা হয়, তাই এর প্রচলন খুব বেশী। অন্য দিকে ধ্রুপদ কিংবা ধ্রুপদাঙ্গের গান বাজনাতেই কেবলমাত্র মৃদঙ্গের ব্যবহার হয়, তাই তবলার তুলনায় এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রচলন অনেক কম।

৮) মৃদঙ্গের বাম দিকের অংশে আটা ও ময়দা লাগান হয় আওয়াজকে গম্ভীর এবং সুমধুর করবার জন্য ; কিন্তু বাঁয়াতে গাব লাগান থাকে, তাই এর আওয়াজ মৃদঙ্গের তুলনায় অনেক হাল্কা।

(৯) প্রয়োজনবোধে বর্তমানে মৃদঙ্গের কিছু তাল তবলায় পরিবেশন করা হয়, কিন্তু তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গে তবলার গৎ পরিবেশিত হয় না।

(১০) দুইটি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলায় রেলা, পেশকার, কায়দা ইত্যাদির অধিক প্রচলন, কিন্তু মৃদঙ্গে গৎ, পরণ প্রভৃতির প্রচলন বেশী।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ণ, বোল বা বাণী

তবলার ও মৃদঙ্গের ভাষা বা অক্ষরকেই বলা হয় বর্ণ, বোল বা বাণী। বিদ্যার্জনে যেমন অক্ষরজ্ঞান অপরিহার্য, তবলা ও মৃদঙ্গ বাদনে সেই প্রকার বর্ণ-পরিচয় অপরিহার্য। বর্ণ দুই প্রকার: সরল বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণ। সরল বর্ণগুলি সাধারণতঃ বাজান হয় একহাতে এবং সংযুক্ত বর্ণগুলি বাজাবার সময় দুই হাতই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবলা ও মৃদঙ্গের বর্ণসংখ্যা বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশ গুণী তবলায় ১০টি এবং মৃদঙ্গের ৭টি বর্ণ স্বীকার করেন। যেমন:

॥ তবলার ১০টি বর্ণ ॥

দক্ষিণ হস্তের বর্ণ

১) তা বা না; ২) তি বা তিন; ৩) দিন্ বা থুন্;
৪) তু বা তুন্; ৫) তে বা তি; ৬) রে বা টে।

বাম হস্তের বর্ণ

৭) কে, কি, ক বা কৎ; ৮) খে বা গে।

উভয় হস্তের বর্ণ

৯) ধা এবং ১০) ধিন্।

॥ মৃদঙ্গের ৭টি বর্ণ ॥

দক্ষিণ হস্তের বর্ণ

১) তা; ২) তে; ৩) টে; ৪) না; ৫) দি।

বাম হস্তের বর্ণ

৬) ক এবং ৭) খ।

উপর্যুক্ত সরল বর্ণগুলির সমন্বয়ে সংযুক্ত বর্ণগুলি উৎপন্ন হয়।

তবলার ১০টি বর্ণের প্রয়োগবিধি

দক্ষিণ হস্তের বর্ণ

১) তা বা না : তবলার মধ্যবর্তী অংশ গাবের কিনারায় অনামিকা রেখে তর্জনী দ্বারা কানিতে আঘাত করলে 'তা' বা 'না' ধ্বনি পাওয়া যায়।

২) তি বা তিন্ : তর্জনীর দ্বারা লবের উপর আঘাত করে তর্জনী উঠিয়ে না নিলে 'তি' এবং তর্জনী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিলে 'তিন্' ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

৩) দিন্ বা থুন্ : তবলার গাবের উপর চারটি আঙুল দ্বারা (তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা) একত্রে আঘাত করে হাত উঠিয়ে নিলে 'দিন্' বা 'থুন্' পাওয়া যায়।

৪) তু বা তুন্ : গাবের কিনারায় তর্জনী দ্বারা আঘাত করলে 'তু' বা 'তুন্' ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

৫) তে বা তি : গাবের মধ্যবর্তী স্থানে অনামিকা ও মধ্যমার সংযুক্ত আঘাতে 'তে' বা 'তি' ধ্বনি হয়।

৬) রে বা টে : কেবলমাত্র তর্জনীর দ্বারা গাবের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করে 'রে' বা 'টে' ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়।

বাম হস্তের বর্ণ

৭) কে, কি, ক বা কৎ : ৫টি অঙ্গুলী একত্রিত করে বাঁয়ার গাবের সম্মুখভাগের উপর আঘাত করলে 'কে', 'কি', 'ক' বা 'কৎ' ধ্বনি পাওয়া যায়।

৮) ঘে বা গে : মধ্যমা এবং তর্জনী একত্রিত করে গাবের সম্মুখ-ভাগে অর্থাৎ স্যাহী এবং চাটীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে আঘাত করলে 'ঘে' বা 'গ' ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

উভয় হস্তের বর্ণ

৯) ধা : তবলার 'তা' এবং বাঁয়ার 'ঘে' বা 'গে' একত্রে বাজালে 'ধ' ধ্বনিটি পাওয়া যাবে।

(১০) ধিন্‌ঃ তবলার 'তিন্‌' এবং বাঁয়ার 'ঘে' বা 'গে' বর্ণের সম্মিলিত আঘাতে 'ধিন্‌' ধ্বনিটি উৎপন্ন হয়।

তবলায় সুর বাঁধার নিয়ম

উত্তম তবলা বাদক হতে গেলে তার সুরজ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কারণ গান অথবা বাজনার পূর্বে যথাযথ সুরে তবলা বেঁধে নিতে হয় এবং এখানে গরমিল হলে তবলা সঙ্গতই করা চলে না। প্রত্যেক তবলা-বাদককেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হয় এবং ক্রমশঃ অভ্যাস করে করে এই বিদ্যাটি অধিগত করতে হয়।

সাধারণতঃ রাগানুযায়ী মধ্য সপ্তকের ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম অথবা তার ষড়জে তবলা বেঁধে নেওয়া হয়। আগেকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্য ষড়জে তবলা বেঁধে গানের সঙ্গে বাজান হত। কিন্তু বর্তমানে গান এবং বাজনা উভয়ক্ষেত্রেই তার ষড়জে তবলা বাঁধা হয়।

তবলায় সুর বাঁধতে দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ, গুলিসমূহকে উপরে উঠান বা নীচে নামান এবং দ্বিতীয়তঃ, হাতুড়ীর সাহায্যে তবলার গজরা বা পাগড়ীর উপরে বা নিম্নভাগে আঘাত করা। গুলিকে উপরে উঠালে তবলার সুর নেমে যায় এবং গুলিকে যত নামান যাবে তবলার সুরও চড়বে। সেইরকম পাগড়ী বা গজরার উপর দিকে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করলে সুর উঁচু হবে এবং নিম্নে আঘাত করলে সুর নীচু হবে। এই নিয়মানুযায়ী প্রথমে তবলার গুলিসমূহকে প্রয়োজন মত উপরে বা নীচে নামিয়ে দিয়ে সুরের সামান্য হেরফের সংশোধন করবার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে পাগড়ী বা গজরার উপরে বা নীচে আঘাত করা হয়। গজরার উপর হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করতে হয় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে; অর্থাৎ আঘাতটি ওজনমাফিক না হলে সুর কিছুতেই মিলবে না। আঘাতের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে তবলার সুর মিলান কিছু সময় এবং পরিশ্রম-সাপেক্ষ হয়।

তবলায় সুর মিলান সঠিক হয়েছে কিনা বোঝবার জন্য সবগুলি ঘাটেই (তবলার ঘাট বা ঘরের সংখ্যা ১৬টি, কিন্তু ২টি ঘাটের মধ্যবর্তী

স্থান ধরে অনেকের মতে ৮টি ঘাট) চাটি মেরে স্বুর শুনতে হয়। যদি সব ঘাটেই একই প্রকার স্বুর শোনা যায় তাহলে তখনই বোঝা যাবে যে স্বুর মিলান যথাযথ হয়েছে! তবলার স্বুর মেলাবার জন্ত সকলেই একই প্রকার পদ্ধতির অনুসরণ করেন না। কেউ কেউ প্রথমতঃ নির্দিষ্ট স্বুরে যে কোনও একটি ঘাট বেঁধে নিয়ে অন্যান্য ঘাটগুলি প্রথম ঘাটটির সঙ্গে মিলিয়ে নেন। আবার কেউ কেউ প্রথমে, যে ঘাটটি মেলান, দ্বিতীয় পর্যায়ে মেলান তার বিপরীত ঘাটটি এবং এই পদ্ধতিতে চারটি ঘাট (১না—৯নং ও ৫নং-১৩নং) বেঁধে তবলার স্বুর মেলান। প্রথম ঘাটটিতে আঘাত করলে 'তিন্'—করে যে ধ্বনি নির্গত হবে সেই ধ্বনি এবং বাঞ্ছিত ধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলে বুঝতে হবে তবলার স্বুর বাঁধা সঠিক হয়েছে। আবার কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করে তবলায় সজোরে আঘাত করলে একটি ধ্বনি উদ্ভূত হয় যাকে বলা হয়—'থাপের তা'। এই বিশেষ ধ্বনিটি অর্থাৎ 'থাপের তা' যদি কম্পিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তবলায় স্বুর মিলান যথাযথ হয়েছে।

হস্ত সাধন প্রণালী

সার্থক তবলা-বাদক হতে গেলে প্রথমেই হস্তসাধন প্রণালীর বিষয়ে অবহিত হতে হবে এবং হস্তসাধনে কোনও ত্রুটি কিম্বা এই বিষয়ে যথেষ্ট রিয়াজ না করলে তবলা বাজনাও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। তবে ঠিকমত হস্তচালনার জন্ত বসবার ভঙ্গিমার উপর প্রথমে নজর দেওয়া প্রয়োজন; কারণ প্রথমেই এমনভাবে উপবেশন করতে হবে যাতে দুটি হাতই অবলীলাক্রমে ব্যবহার করা যায়। তবে এই উপবেশনের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। কেউ কেউ আসনপিঁড়ি হয়ে বাজাতে বসেন, কেউবা ডান অথবা বাম পা পিছন দিকে মুড়ে তবলা বাজিয়ে থাকেন। তাছাড়া বীরাসনের মত বসে অথবা ডান পা সামান্য এগিয়ে বা ছড়িয়ে দিয়েও বসতে দেখা যায়।

উপরি উক্ত যে কোনও বসবার একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি তবলার উপর এবং বাম হস্তটি বাঁয়ার উপর সহজভাবে রাখতে

হবে। এরপর তবলার বর্ণগুলির যথাযথ প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে হবে ; অর্থাৎ এক বা একাধিক অঙ্গুলীর মধ্যে যেটি যে বর্ণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সেটিকে সেই বর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে তৈরী করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঠিক ধ্বনি বের করতে চেষ্টা করতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণের মত বর্ণটির প্রয়োগও স্পষ্ট হওয়া চাই। ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে করতে যখন হাতের জড়তা আর থাকে না এবং বর্ণ বা বোলগুলি স্পষ্ট বাজে ও হাতও চালু হয়ে যায় তখন ক্রমশঃ লয় বাড়িয়ে দ্রুতলয়ে সেগুলি অভ্যাস করলে বর্ণগুলি সড়্‌গড়্‌ হয়ে যায়। এইভ'বে বিজ্ঞানসম্মতভাবে হস্তসাধন পদ্ধতি অনুসরণ করলে পরবর্তী কঠিন চিজগুলি সহজতর হয়ে আসে।

হস্তসাধন পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হ'ল।—

১) একটি বর্ণ সহযোগে :—

তে, রে, কে, টে, তা, ক, তা, ক ; কে, টে, তা, ক, তে, রে, কে, টে ;
তে, টে, তে, টে, ধা, গ, তে, টে ; ধে, রে, ধে, রে, ধে, টে, ধে, টে।

২) একটি এবং দুটি বর্ণের মিশ্রণে :

ধা, ধিন্‌, ধাধা, ধিন, না, তিন, তাতা, তিন ; থুন, না, কৎ, তা, ধেৎ, ধেৎ, ঘেঘে, তেটে।

৩) তিনটি বর্ণের সহযোগে :—

ধাতেটে, তাতেটে, তগেন, ধগেন ; কতিট, ধাত্রক, নাতিট, দেঘিন।

৪) চারটি বর্ণ সহযোগে :—

ঘিড়নগ, কিড়নগ, ধুমকিট, নকধিন ; তিটকত, কিটতক, নগতিট, গদগিন, ধাড়াগিন, ধিরধির, ধিরকিট ইত্যাদি।

পাখোয়াজের বোলের কয়েকটি নমুনা :—

কতিট, কতাধ, তাকিট, তকধে, কতাধতা, তক্কাথুংগা, গদিঘেনে, ধুমাতেটে, দিন্‌তা, ঘেনেনাগ ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

তবলার পারিভাষিক শব্দাবলী

তাল : তল্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে তাল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে; অর্থাৎ গীত, বাদ্য, এবং নৃত্য যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে তাল শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

"তকারে শঙ্কর : প্রোক্তো লকারে পার্বতীস্মৃতা।
শিবশক্তি সমাযোগাত্তাল ইত্যভিধীয়তে ॥" [সংগীতদর্পণ]

অর্থাৎ 'ত'-কার শঙ্কর বা শিব এবং 'ল'-কারে শক্তি, এই দুটি বর্ণের সংযোগে 'তাল' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ হর-গৌরীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যক্ষরদ্বয় নিয়ে তাল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'সংগীত তরঙ্গ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"হরগৌরী নৃত্য হইতে সৃষ্টি হইল তাল"।

প্রকৃতপক্ষে সংগীতে তাল বলতে বোঝায় কাল পরিমাণ বিশেষ। গীত বাদ্য বা নৃত্যের গতি তথা লয়ের স্থিতি নিরূপণ করাকেই বলা হয় তাল। বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ মাত্রাসমষ্টি সহযোগে তাল গঠিত হয় এবং তাল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন : প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা নিয়ে ১৬ মাত্রার তালের নাম ত্রিতাল, পাঞ্জাবী, তিলোয়াড়া প্রভৃতি, প্রতি ভাগে দুটি করে মাত্রা নিয়ে ১২ মাত্রায় তালের নাম একতাল বা চৌতাল, ২।৩ ছন্দের ১০ মাত্রার তালকে বলা হয় ঝাঁপতাল ইত্যাদি। গীত, বাদ্য বা নৃত্য কোন না কোন তালে নিবদ্ধ থাকবেই, তাই সংগীতে তাল একটি অপরিহার্য অঙ্গ অর্থাৎ এক কথায় তালকে সংগীতের প্রাণ বলা যায়।

মাত্রা : মা+ত্র করণ বাচ্যে+আপ স্ত্রীং=মাত্রা। মাত্রা অর্থে পরিমাণ। অর্থাৎ তালকে যে পরিমাণ করে তাকেই বলা হয় মাত্রা, অথবা তালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগগুলিকে বলা যায় মাত্রা। উদাহরণস্বরূপ ঘড়ির পেণ্ডুলামের প্রতিটি 'টক্-টক্' শব্দকে এক একটি মাত্রা আখ্যা দেওয়া যায়; কারণ এই ভাবেই পেণ্ডুলাম দ্বারা ঘড়ির সময়ের পরিমাপ হচ্ছে। বিক্রয় দ্রব্য পরিমাপ

করবার জন্য যেমন মিটার, লিটার, গ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, সংগীতেও সেইরূপ তার গতি বা লয়ের পরিমাপ করা হয় মাত্রার দ্বারা।

মার্গ তালে মাত্রা ব্যবহৃত হত তিন প্রকার, যথা : গুরু, লঘু ও প্লুত এবং দেশী তালে এই তিনটি ব্যতীত দ্রুত নামে আরও একটি মাত্রার বিভাগ প্রচলিত হয়। বিভিন্ন প্রকার মাত্রার সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। প্রাচীন গ্রন্থকার কল্লিনাথের মতে তালের লঘু মাত্রা হবে পাঁচটি লঘু অক্ষর নিয়ে এবং এক অক্ষর নিয়ে হবে ছন্দের লঘুমাত্রা। কারও কারও মতে একটি লঘুমাত্রার সময়কাল ৬টি অক্ষর পর্যন্ত, কারও মতে ৪ অক্ষর পর্যন্ত, আবার ৪ অক্ষরেরও কম সংখ্যক অক্ষরে অনেকে লঘু মাত্রার সময়কাল নির্দেশ করেছেন। কোনও কোনও প্রাচীন শাস্ত্রকার মাত্রার সময় নির্ধারণের জন্য আবার পাখীর ডাকের সঙ্গে মাত্রার সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক ১টি লঘু মাত্রা, কাকের ডাক ২টি লঘুমাত্রা এবং ময়ূরের ডাককে ৩টি লঘুমাত্রার সমান বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে ঘড়ির সময়ের এক সেকেণ্ড মুহূর্ত সময়কে একটি লঘু মাত্রার সময়কাল বলে মানা হয়।

বর্তমানে ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে ছয় প্রকার মাত্রার প্রচলন আছে। যথা—লঘু, গুরু, দ্রুত, অনুদ্রুত, প্লুত এবং কাকপদ। নিম্নে এই ছয় প্রকারের মাত্রাসংখ্যা উল্লেখ করা হল।

লঘু = ১ মাত্রা গুরু = ২ মাত্রা দ্রুত = $\frac{১}{২}$ মাত্রা

অনুদ্রুত = $\frac{১}{৪}$ „ প্লুত = ৩ „ কাকপদ = ৪ „

ঠেকা : তবলার কতকগুলি বর্ণকে প্রয়োজনানুসারে ছন্দোবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট মাত্রা বিভাগ সহকারে সুসমঞ্জস্য লয়ে বাজানকে বলা হয় ঠেকা। মাত্রা, ছন্দ তথা বিভাগ অনুযায়ী ঠেকার প্রকারভেদ আছে এবং প্রত্যেক প্রকার ঠেকার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। ঠেকার মাত্রাসংখ্যা নানা প্রকারের হয় অর্থাৎ মোটামুটি ৪ হতে ২৮ পর্যন্ত হয়ে থাকে ; তবে প্রচলিত ঠেকার প্রায় সবগুলিই ৪ হতে ১৬ মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মাত্রার একটি তাল বাজাতে হলে সেই তালের ঠেকা দিয়ে বাজনা আরম্ভ করা হয়। সেইজন্য তবলা বাদনে ঠেকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তালি বা ভরী : তালের বিভিন্ন বিভাগের যতিসমন্বিত প্রারম্ভিক মাত্রাকে হাতে তালি দিয়ে সশব্দে প্রকাশ করাকে বলা হয় তালি বা ভরী। বিভিন্ন তালে তালির সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। কোন বিশেষ তালের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার জন্যই তালির ব্যবহার করা হয়। ঠেকার নিয়ে '+' বা '×' চিহ্ন সহ সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি তালির নির্দেশক। যেমন—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না
×				২				০			

১৩	১৪	১৯	১৫
তেটে	ধিন	ধিন	ধা

উপরি উক্ত বোলটি ত্রিতালের এবং এই তালে '×' চিহ্ন সহ দুটি সংখ্যা আছে ২ ও ৩। অতএব ত্রিতালে তালের সংখ্যা হবে তিনটি।

খালি বা ফাঁক : যতিহীন বিভাগগুলি যা হাতে তালি দিয়ে দেখান হয় না সেইগুলিকে বলা হয় খালি বা ফাঁক। খালি বা ফাঁকের সময় দক্ষিণ হস্তটিকে ঈষৎ সামনের দিকে প্রসারিত করে দেখান হয়। তালে এক বা একাধিক ফাঁক থাকতে পারে এবং '০' চিহ্নদ্বারা ফাঁকের অস্তিত্ব বোঝান হয়। যেমন উপরিউক্ত ত্রিতালে খালি বা ফাঁক মাত্র ১টি এবং সেটি ৯ মাত্রায়।

সম : তালের প্রারম্ভিক স্থান অর্থাৎ যেখান হতে তালের মাত্রা-রম্ভ সেই বিশেষ স্থানটিকে বলা হয় সম। সাধারণভাবে তালের প্রথম মাত্রাটিকেই সম্ বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সম-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে গান বাজনায় সাধারণতঃ সমের স্থানে একটু জোর দেওয়া হয়

এবং সমের স্থানটিতে থাকে কিছু বৈচিত্র্য বা শ্রোতাগণকে উল্লাসিত করে। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা সমকে বোঝান হয়। যেমন, '+', '×', '৪', '১' ইত্যাদি।

ছন্দ বা বিভাগ: কতকগুলি গতিসৌন্দর্যবিশিষ্ট পরিমিত মাত্রা-সমন্বিত পদকে বলা হয় ছন্দ। তালে ছন্দের বৈশিষ্ট্য দেখান হয় তাকে নানাভাবে বিভক্ত করে এবং মাত্রাসমষ্টির এক একটি অংশকে বলা হয় 'বিভাগ'। প্রত্যেকটি তালই ছন্দানুযায়ী একাধিক বিভাগ সমন্বিত। নিম্নে কয়েকটি তালের ছন্দ, বিভাগ এবং মাত্রাসমষ্টির উল্লেখ করা হল।

তাল	ছন্দ	বিভাগ	মাত্রাসংখ্যা
দাদরা	৩।৩	২	৬
তীব্রা	৩।২।২	৩	৭
কাহারবা	৪।৪	২	৮
ঝাঁপতাল	২।৩।২।৩	৪	১০
ত্রিতাল	৪।৪।৪।৪	৪	১৬

আবর্তন: যে কোনও তালের বোল প্রথম মাত্রা থেকে শেষ পর্যন্ত বাজান হলে বলা হয় আবর্তন, আবর্ত বা আবৃত্তি। এইভাবে একবার বাজালে বলা হয় এক আবর্তন, দুইবার বাজালে দুই আবর্তন ইত্যাদি। তালের মোট মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে এক একটি আবর্তনের সময়কাল।

কায়দা: কোন একটি নির্দিষ্ট তালের রূপ যথাযথ বজায় রেখে অর্থাৎ তালি, খালি ইত্যাদি অপরিবর্তিত রেখে ঠেকানুযায়ী কিছু অতিরিক্ত বর্ণসমষ্টির সংমিশ্রণগত প্রয়োগকে বলা হয় কায়দা। কায়দা সাধারণতঃ দুই হতে তিন আবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। ভরী এবং খালি এই দুই ভাগে কায়দা পরিবেশিত হয়ে থাকে। হস্তসাধন এবং তবলার একক বাদনে (Solo) কায়দার প্রয়োগ অনিবার্য এবং শ্রুতিমধুর।

পেশকার : কায়দারই বিশেষ এক প্রকারকে বলা হয় পেশকার। তবে কায়দা বাজান হয় সমান লয়ে, কিন্তু পেশকার বাজান হয় দ্বিগুণ হতে আটগুণ লয়ে। তাছাড়া কায়দার তুলনায় পেশকারে থাকে অলঙ্কার-বাহুল্য। কোন কোন ঘরানার বাজে (দিল্লী, অজরাড়া) পেশকার দ্বারাই বাজনা আরম্ভ করা হয়; কারণ যে বিশেষ তাল বাদক পরিবেশন করবেন পেশকারেই তার আভাস দেওয়া হয়। পেশকারে ধিকড়, ধিনতা, ত্রেকে, ধাক্রান, ক্রেধা ইত্যাদি বোল অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ধিকড় ধিনাগ ধাক্রান ধাতেটে | ধিকড় ধিনাগ ঘেনেনাক্ তা
× | ২

তিকড় তিনাক কেটেতাকে তেরেকেটে | ধিকড় ধিনধা ঘেড়েনাগ ধা
০ ৩

পাল্টা : কায়দার বিস্তার করাকেই বলা হয় পলট্ বা পাল্টা। পাল্টাতে কায়দার বর্ণগুলি নানাপ্রকারে উলটিয়ে পালটিয়ে বিস্তার করা হয় এবং কায়দার মতই পাল্টারও প্রথম ভাগকে ভরী এবং দ্বিতীয় ভাগকে খালি বলা হয়। পাল্টা বাজাবার সময় তালের বিভাগগুলি যথাযথ রাখতে হয়। যেমন—

কায়দা—ত্রিতাল

ধা গে তে টে | ধা ধা তু না | তা গে তে টে | ধা ধা তে টে
× | ২ | ০ | ৩

॥ পাল্টা ॥

ধা গে তে টে | ধা ধা তু না | ধা গে তে টে | ধা ধা তু না
ধা গে তে টে ধা ধা তু না | ধা ধা তু না | তা গে তে টে
তা গে তে টে | ধা ধা তে টে | তা গে তে টে | ধা ধা তে টে
তা গে তে টে | ধা ধা তে টে | ধা ধা তু না | ধা গে তে টে
+ ২ ০ ৩

উঠান : নৃত্য অথবা একক বাদনের (Solo) প্রারম্ভে যে বোল বাজান হয় তাকে বলা হয় উঠান। সকল বাজেই উঠানের প্রয়োগবিধি প্রচলিত থাকলেও, বিশেষ করে পূরব বাজেরই এটা বৈশিষ্ট্য। প্রথমে

বরাবর লয়ে উঠান বাজিয়ে তারপর দ্রুত লয়ে অর্থাৎ দুগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বাজান হয়।

আবৃত্তি : তালের প্রথম মাত্রা হতে শেষ মাত্রা পর্যন্ত পরিক্রমাকে বলা হয় আবৃত্তি বা আবর্তন। এক একবার পরিক্রমায় এক একটি আবৃত্তি শেষ হয় এবং এইভাবে একটি তাল একাধিক বার আবৃত্তি হয়ে থাকে।

রেলা : কায়দার অনুরূপ বর্ণগুলিকে চৌগুণ বা আটগুণ লয়ে বাজান হলে তাকে রেলা বলা হয়। রেলার বোলে বিশেষ বৈচিত্র্য থাকে না। রেলা বাজাতে হলে সবিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কারণ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হাত না হলে দ্রুত লয়ে স্পষ্টভাবে রেলা বাজান সম্ভব নয়। বৃষ্টির ধারার মত রেলা অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর। রেলা দুই প্রকার—১) কায়দা রেলা এবং ২) স্বতন্ত্র রেলা।

কায়দা রেলা—কায়দাতে যে বর্ণগুলির প্রয়োগ হয় সেই একই বর্ণ-সমষ্টি দ্বারা রেলা রচিত হলে তাকে বলা হয় কায়দা রেলা, অর্থাৎ কায়দা রেলার প্রকৃতি কতকটা কায়দার পাল্টার মত হয়।

স্বতন্ত্র রেলা—কায়দা নিরপেক্ষ পাখোয়াজের অনুরূপ বোল-সহযোগে যে রেলা গঠিত হয় তাকে বলা হয় স্বতন্ত্র রেলা। যেমন—

ধাতে টেধা ক্রেধা তেটে | ধাগে নেধা গেনে থুনা
×   ২

তাতে টেধা ক্রেধা তেটে | ধাগে নেধা গেনে থুনা | ধা
০   ৩   ×

পরণ : পাখোয়াজের বোলের অনুরূপ জোয়াল বর্ণের সাহায্যে একাধিক আবর্তনে যে বন্দিশ তবলায় বাজান হয় তাকে বলা হয় পরণ। পরণের প্রয়োগ এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে; কারণ পরণ মুখ্যতঃ পাখোয়াজে বাজান হয়। পূরব বাজে পরণের প্রয়োগাধিক্য দেখা যায়। একক বাদনেই বর্তমানে পরণের প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ তিহাই সহ এগুলি রচিত হয় এবং তিন আবৃত্তির মধ্যে সীমিত থাকে। তবে পরণে তিনের অধিক আবৃত্তিও

হতে পারে এবং এর মধ্যে নানা লয়েরও সমাবেশ করা হয়ে থাকে। পরণের আবার প্রকারভেদ আছে; যেমন, গৎপরণ, বোলপরণ, তাল-পরণ এবং সাথপরণ। আবার কোনও শ্লোকের অনুসরণে পরণ রচিত হলে সেই বিশেষ শ্লোকের নামানুসারে পরণের নাম হত, যেমন—শিবপরণ, লক্ষীপরণ ইত্যাদি। তবে এই বিভিন্ন প্রকারের পরণ একমাত্র পাখোয়া-জেই প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তবলায় যে পরণ বাজান হয়ে থাকে তাতে ধাগেতেটে ক্রেধাতেটে, তাগেতেটে, ধেৎ, ধেৎ গদিঘেনে ইত্যাদি বর্ণসমূহের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

ধেটেধেটে ধাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে
×
ক্রেধা-তি তাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে
২
ধেৎ ধেৎ তেরেকেটেধেৎ ঘেঘেতেটে ধাগেতেটে
০
ধেৎতাগি – ন্নাধেৎ তাগি-ন্না ধেৎ ধেৎ ধেৎ | ধা
৩ ×

ফরমাইশী পরণ : ফরমাইশমত কোন পরণ শোনান হলে তাকে ফরমাইশী পরণ বলা হয়। ফরমাইশী পরণের মধ্যে আবার প্রকারভেদ আছে, যেমন একহত্থী পরণ, লোম বিলোম পরণ ইত্যাদি। একহত্থী পরণ রচনায় ক, গ, ধ বা ধা ইত্যাদি বোল থাকে না এবং লোম বিলোম বোলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এর বোলগুলি সোজা উল্টা যেমনই পড়া যাকনা কেন সমান হবে।

কমালী পরণ : সাধারণ পরণের অতিরিক্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ পরণকেই বলা হয় কমালী পরণ।

বোল : তবলা বা মৃদঙ্গের বর্ণগুলির সুসম্বদ্ধ রূপের নাম 'বোল'। সুতরাং কায়দা, পেশকার, রেলা, পরণ ইত্যাদি সব কিছুকেই 'বোল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

টুকড়া : বর্ণগুলির ছন্দোবদ্ধ সীমিত রচনাকেই বলা হয় টুকড়া।

কায়দা, পেশকার ইত্যাদির মত টুকড়ার বিস্তার হয় না। টুকড়াকে গীতের তান বা তন্ত্রবাদ্যে ব্যবহৃত তোড়ার অনুরূপ বলা চলে। তান বা তোড়ার মত টুকড়া সাধারণতঃ খুব বড় হয় না এবং এগুলি প্রায়শই তিহাই দিয়ে শেষ করা হয়। গান বা বাজনায় তবলা সঙ্গতে চমৎকারিত্ব উৎপাদনের জন্য টুকড়াকে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে একটি টুকড়ার উদাহরণ দেওয়া হল।—

তাতি নতিন তাতি নতিন | তাকেটে তাঘেনে তাঘেনে
০ ৩

তাঘেনে | ধা
×

চক্রদার: তিহাই সংযুক্ত কোন রচনা চক্রাকারে কমপক্ষে তিন আবর্তন বাজাবার পর সমে এসে শেষ হলে তাকে বলা হয় চক্রদার বোল বা টুকড়া। চক্রদার বোলের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর তিহাই-য়ের প্রথম দুই অংশ সমে এসে না পড়লেও শেষাংশ যথারীতি সমে এসে পড়ে। যেমন।—

ধাধিন ধাকেটে তাকেটেতা কেটেকে-ট | ধুমাকেটে তাকেটেতা
× ২

কেটেকেটে তাকধুম

কেটেতাক গদিঘেনে ধা-ধাধিন | ধাকেটে তাকেটেতা কেটেকেটে
০ ৩

ধুমাকেটে

তাকেটেতা কেটেকেটে তাকধুম কেটেতাক | গদিঘেনে ধা—ধাধিন
× ২

ধাকেটে

তাকেটেতা কেটেকেটে ধুমাকেটে তাকেটেতা | কেটেকেটে
০ ৩

ধুমাকেটে কেটেতাক গদিঘেনে | ধা
×

মুখড়া বা মোহরা: তিহাইসমন্বিত বা তিহাইরহিত অল্প সংখ্যক বর্ণ দ্বারা রচিত যে বোল গীত বা বাদ্যের ছন্দানুযায়ী সমে এসে শেষ হয় তাকে বলা হয় মুখড়া বা মোহরা। তবে অনেকে মুখড়া এবং মোহরাকে পৃথক বলে মনে করেন। তাদের মতে মোহরা অপেক্ষা মুখড়ার বোল গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থাৎ মুখড়াকে এক প্রকারের ক্ষুদ্র টুকড়া বলা চলে।

কিন্তু মোহরা মুখড়া অপেক্ষা হয় ক্ষুদ্রতর এবং সরল। তবে সাধারণভাবে এই দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। গীত বা বাদ্যে মুখড়া বা মোহরার প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।—

তেৎ তা তেটেতেটে | নাতি নাতি নাকতেটে তেরেকেটে | ধা
০ ৩ ×

লগ্‌গী: কাহারবা দাদরা, পোস্ত, রূপক ইত্যাদি ছোট তালে কায়দার মত ছন্দবৈচিত্র্য সম্পন্ন যে বর্ণসমষ্টি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় লগ্‌গী। কায়দা থেকে লগ্‌গী হয় আকারে ক্ষুদ্র, তবে কায়দার মত লগ্‌গীতেও বিস্তারের কাজ করা চলে। সাধারণতঃ গজল, ভজন, ঠুংরী ইত্যাদি গানে লগ্‌গী পরিবেশিত হয় এবং লগ্‌গীর প্রয়োগে তবলা সংগত আরও শ্রুতিমধুর হয়। একটি কাহারবার লগ্‌গীর নমুনা—

ধাতি ধাধা তিনা কিনা | তাতি ধাধা ধিনা ঘিনা
× ০

লড়ী: লগ্‌গী বা তার অংশবিশেষকে দুগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বাজান হলে তাকে বলা হয় লড়ী। লগ্‌গী বাজাবার পরে লড়ী বাজান হয় তবলা বাদনকে আরও অধিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন করবার জন্য। একটি লড়ীর নমুনা—

ঘেঘেতেটে গদিঘেনে নাগতেটে কেটেতাক
০
তাগতেটে ঘেঘেতেটে গদিঘেনে নাগতেটে | ধা
৩ ×

বাঁট: লগ্‌গীর বিস্তারকেই বলা হয় বাঁট। কিন্তু মতান্তরে যে কোনও বোলের বর্ণসমষ্টির উল্টা-পাল্টা প্রয়োগকে বাঁট বলা হয়। বাঁটকে কায়দা ও পেশকারের এক প্রকার সম্মিলিত রূপ বলা চলে। নিম্নে একটি ত্রিতালের বাটের নমুনা দেওয়া হল।—

ধিন তেরেকেটে ধিন্ না | ধা ধিন্ ধিন্ না
×　　　　　　　　　　২

তিন্ তেরেকেটে তিন্ না | না ধিন্ ধিন্ না | ধা
০　　　　　　　　　　৩　　　　　　　×

তিহাই বা তিহা : কোনও তালের সম বা ফাঁক হতে আরম্ভ হয়ে যে বোল তিনবার বাজাবার পর সমে এসে সমাপ্ত হয় তাকে বলা হয় তিহাই বা তিহা। সম বা ফাঁক হতে আরম্ভ না করে অন্য যে কোনও মাত্রা হতে তিহাই সুরু করা যেতে পারে, তবে সেই অংশটি তিনবার বাজাতেই হবে এবং সমে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তিহাই দুই প্রকার—দমদার ও বেদমদার।

দমদার তিহাই—তিহাইয়ের তিনটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেমে থেমে (Pause) বাজিয়ে সমে এলে তাকে বলা হয় দমদার তিহাই। যথা—

ধা, তেরে কেটেতাক ধা—, ধাতেরে | কেটেতাক ধা—, ধাতেরে
০　　　　　　　　　　　　　৩

কেটেতাক | ধা
×

বেদমদার তিহাই—কোথাও না থেমে তিনটি বিভাগ বাজিয়ে সমে এসে যে বোল শেষ হয় তাকে বলা হয় বেদমদার তিহাই। যথা—

ধাতেরেকেটেতাক তাতেরেকেটেতাক ধা তেরেকেটে
০

ধাতেরেকেটেতাক

তা তেরেকেটেতাক ধা তেরেকেটে ধাতেরেকেটেতাক
৩

তাতেরেকেটেতাক | ধা
×

নবহক্কা তিহাই : তিহাইয়েরই বিশেষ একটি প্রকার হচ্ছে নবহক্কা তিহাই। এই তিহাইয়ে একই বোল নয় বার বাজাতে হয় এবং প্রতি তিনবার অন্তর দুইটি ধা অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একটি

তিহাইকে তিনবার বাজালেই ৩×৩=৯ বার বাজান হচ্ছে। নবহক্কা তিহাইয়ে নয়টি ধা-এর রূপ দেখান হয়।

কিসিম : কোন তালের তালি, খালি বিভাগাদি ইত্যাদি যথাযথ রেখে ঠেকার বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগকে বলা হয় কিসিম বা প্রকার যেমন—

ধাতি নাতি তাতা খিন্ | ধা খিন্ ধাগে তিন
×   ২
নাতি নাতি নানা খিনা | না খিন্ নাগে খিন
০   ৩

লহরা : একক তবলা বাদনে (Solo) কায়দা, পেশকার, রেলা ইত্যাদি সহযোগে বিভিন্ন লয়কারীতে বোল বাজান হলে তাকে লহরা বলা হয়। তবলা বাদনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন না করলে লহরা বাজান সম্ভব হয় না। লহরা বাজাবার সময় কোন একটি যন্ত্রে (হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী ইত্যাদি) যে কোনও একটি রাগের গতের প্রারম্ভিক অংশটুকু বারবার বাজান হয় ফাঁক ও সম স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্ম।

সাথসংগত : নৃত্য, গীত বা বাদ্যের ছন্দানুযায়ী সংগত করা হলে তাকে বলা হয় সাথসংগত। অর্থাৎ শিল্পী যে ছন্দেরই প্রয়োগ করবেন তবলাবাদকও তবলায় তার সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ছন্দে তাকে অনুসরণ করবেন। তবে অনেকের মতে শিল্পী প্রথমে ছন্দের প্রয়োগ করবেন এবং তার সেই বিশেষ ছন্দের কাজ শেষ হলে তবলাবাদক শিল্পী কর্তৃক প্রযুক্ত সেই বিশেষ ছন্দটি তবলায় যথাযথ প্রয়োগ করে দেখালে তাকে সাথসংগত বলে। সাথসংগত করতে হলে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। নৃত্য, গীত বা বাদ্যে সাথসংগত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

গৎ : তিহাই বর্জিত খালি ও ভরীযুক্ত লঘু বৈচিত্র্যসম্পন্ন রচনাকে বলা হয় গৎ। গৎ বাজান পূরব বাজের বৈশিষ্ট্য। গতের আকার ছোট এবং বড় দুই প্রকারই হতে পারে। সাধারণতঃ গৎগুলি বিলম্বিত লয়ে বাজাবার সাধারণ, তিনগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজান হয়। গতের দুইটি শ্রেণী আছে, শুদ্ধ ও মিশ্র।

শুদ্ধ গৎ—একটি মাত্র বরাবর লয়ে যে গৎ বাজান হয় তাকে বলা হয় শুদ্ধ গৎ।

মিশ্র গৎ—একাধিক লয়ের মিশ্রণজাত যে গৎ তাকে বলা হয় মিশ্র গৎ। মিশ্রগৎ লক্ষ্ণৌ ও বেনারস ঘরাণার বৈশিষ্ট্য।

শুদ্ধ ও মিশ্র ব্যতীত গতের আরও কয়েকটি প্রকার আছে, যথা—দুপল্লী, তিপল্লী এবং চৌপল্লী গৎ।

দুপল্লী গৎ—পল্লী অর্থে বিভাগ দুটি বিভাগে দুই প্রকার লয়ের মিশ্রণজাত গৎকেই বলা হয় দুপল্লী গৎ।

তিপল্লী গৎ—কোনও গতের প্রথম বিভাগে তিন প্রকার লয়ের প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় তিপল্লী গৎ।

চোপল্লী গৎ—চারটি লয়ের মিশ্রণজাত গৎকে বলা হয় চৌপল্লী গৎ। অথবা কোনও বোলকে যদি এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে তার চারটি খণ্ড স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে তাহলে তাকেও বলা হয় চৌপল্লী গৎ।

চলন বা চালা : বিভিন্ন ঘরাণার তবলা-বাদকদের বাদনপদ্ধতিও ভিন্ন। যেমন দিল্লী ঘরাণার শিল্পী যে ঢঙে (Style) উঠান, পেশকার, গৎ, টুকড়া ইত্যাদি বাজাবেন, লক্ষ্ণৌ বা বেনারস ঘরাণার শিল্পীর বাদনশৈলী তার থেকে পৃথক হবে এবং এই পার্থক্যকেই বলা হয় চলন বা চালা।

খুলি ও মুদি : রেশ বা লোমযুক্ত বাণীকে বলা হয় খুলি বাণী, যেমন : তুন্, থুন্, তিন্‌ধিন্ ইত্যাদি এবং চাপা অর্থাৎ লোমহীন বাণীকে বলা হয় মুদি বাণী, যেমন : কৎ, গে, কে ইত্যাদি।

ফরদ : ফরদের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। একমতে যে বোলের জোড়ের কোনও প্রকারভেদ হয় না তাকে বলা হয় ফরদ বা একড়। আবার মতান্তরে বোলের শেষাংশে "তেরেকেটে তাকতা, কৎধেরে কেটেতাক" ইত্যাদি বাণী থাকলে তাকে ফরদ নামে অভিহিত করা হয়।

বেগরকিটি : বর্জিত অর্থে উর্দু ভাষায় 'বেগর' শব্দটির প্রয়োগ হয়। সুতরাং *'কিটি (কেটে)' বর্জিত বোলসমূহকেই পূর্বে বলা হত বেগর* কিটি।

অঙ্গুস্তানা : তবলার *চাটি বা স্যাহীর উপর কেবলমাত্র অঙ্গুলীর* সাহায্যে কোন টুকরা বাজান হলে সেই বোলকে বলা হয় অঙ্গুস্তান।

চতুর্থ অধ্যায়

তালের দশবিধ প্রাণ

প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রাদিতে তালের ১০টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাদের তালের দশপ্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। "সংগীতমকরন্দ"—কার নারদের মতে এই দশটি প্রাণ হল :

"কালো মার্গ—ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহোজাতিঃ কলা লয়ঃ।
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার—এই দশটি বিষয় হচ্ছে তালের দশটি প্রাণ।

নিম্নে সংক্ষেপে তালের ১০টি প্রাণের আলোচনা করা হল।—

(১) **কাল :** সংগীতের অর্থাৎ গীত, বাদ্য বা নৃত্যের নির্দিষ্ট সময় সীমাকে বলা হয় কাল এই কাল-এর উপর সমগ্র তাল পদ্ধতির কাঠামো দণ্ডায়মান। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাল নির্ণয় করেছেন, তবে সেই সকল পদ্ধতি সর্ববাদ সম্মত নয়। কালকে আবার সূক্ষ্ম ও স্থূল-এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(২) **মার্গ :** মার্গ অর্থে পথ। মার্গ দ্বারা তালের মাত্রাসংখ্যা গতিভঙ্গি, তালি, খালি এবং সেইগুলির অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় যে, এর দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তালের প্রকৃতি বিচার করা যায়। শাস্ত্রে প্রধানতঃ চারটি মার্গের উল্লেখ আছে, যথা—ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক ও দক্ষিণ। তালের পরিবর্তনের প্রয়োজনেই এই চারটি মার্গ ব্যবহৃত হয়।

(ক) ধ্রুবমার্গ : একমাত্রিক পদ এবং প্রথম মাত্রায় তালাঘাত।

(খ) চিত্রমার্গ : দ্বিমাত্রিক পদ। প্রথম মাত্রায় তালাঘাত ও দ্বিতীয় মাত্রায় ফাঁক।

(গ) বার্তিক মার্গ : চতুর্মাত্রিক পদ। ১ম মাত্রায় তালাঘাত ও ৩য় মাত্রায় ফাঁক।

(ঘ) দক্ষিণ মার্গ: অষ্টমাত্রিক পদ। ১ম মাত্রায় তালাঘাত ও ৭ম মাত্রায় ফাঁক।

কোনও মতে ৬টি মার্গের উল্লেখও পাওয়া যায়, যথা: চিত্র, চিত্রতর, চিত্রতম, অতিচিত্রতম, বার্তিক ও দক্ষিণ।

(১) চিত্র ...২ মাত্রিক পদ
(২) চিত্রতর ...১ " "
(৩) চিত্রতম ...১/২ " "
(৪) অতিচিত্রতম ...১/৮ " "
(৫) বার্তিক ...৪ " "
(৬) দক্ষিণ ...৮ " "

অন্যমতে উপর্যুক্ত ৬টি মার্গ ব্যতীত আরও ৬টি মার্গের উল্লেখ আছে। যথা—চতুর্ভাগ ক্রটি,, অনুক্রটি, ঘর্ষণ, অনুঘর্ষণ এবং স্বর।

(১) চতুর্ভাগ ...১/৮ মাত্রিক পদ
(২) ক্রটি ...১/১৬ " "
(৩) অনুক্রটি ...১/৩২ " "
(৪) ঘর্ষণ ...১/৬৪ " "
(৫) অনুঘর্ষণ ...১/১২৮ " "
(৬) স্বর ...১/২৫৬ " "

(৩) **ক্রিয়া:** তাল প্রদর্শক কর্মকে বলা হয় ক্রিয়া। হাতে তালি, দেওয়া, অঙ্গুলী গণনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। ক্রিয়া দুই প্রকারের—সশব্দ এবং নিঃশব্দ। সশব্দ ক্রিয়া চার প্রকার, যথা: ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত এবং নিঃশব্দ ক্রিয়াও চার প্রকার, যথা: আবাপ, নিষ্ক্রম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ।
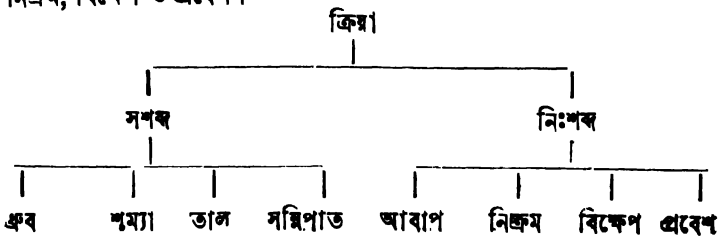
সশব্দ ক্রিয়া :- (১) ধ্রুব...তর্জনী বা বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে আঘাত।

(২) শম্যা·· বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তে আঘাত।

(৩) তাল...দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে বাম হস্তের আঘাত।

(৪) সন্নিপাত...উভয় হস্ত দ্বারা আঘাত।

নিঃশব্দ ক্রিয়া :—

(১) আবাপ...চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে উর্ধে হস্তচালনা।

(২) নিষ্ক্রম ..উন্মুক্ত চারটি অঙ্গুলীসহ দক্ষিণ দিকে বাহু চালনা।

(৩) বিক্ষেপ...উন্মুক্ত অঙ্গুলীসহ হস্ত চালনা।

(৪) প্রবেশ...হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় নিম্নাভিমুখে চালনা।

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে নিঃশব্দ ক্রিয়ার অনুরূপ একটি ক্রিয়ার নাম বিসর্জিতম। ফাঁককে বলা হয় বিসর্জিতম্ বা বিচ্‌চে। বিসর্জিতম তিন প্রকার, যথা : কৃষ্য, সর্পিণী ও পতাকম্।

(১) কৃষ্য—বাম দিকে হস্তচালনা।

(২) সর্পিণী-দক্ষিণ দিকে হস্ত চালনা।

(৩) পতাকম্—হস্তকে উর্ধাভিমুখী করা।

(৪) অঙ্গ : অঙ্গ বলতে বোঝায় তাল বিভাগ। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে এই অঙ্গ বিভাগ বিশেষ করে মানা হয়। অঙ্গের সংখ্যা প্রধানতঃ ছয়টি, যথা : অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত এবং কাকপদ। নিম্নে এই ষড়াঙ্গের চিহ্ন ও অক্ষর কাল (সময়-পরিমাপক সংখ্যা) প্রভৃতি উল্লেখ করা হল।

অঙ্গের নাম	চিহ্ন	অক্ষর কাল
(১) অনুদ্রুত	◡	১
(২) দ্রুত	o	২
(৩) লঘু	|	৩
(৪) গুরু	ও বা ৪	৮
(৫) প্লুত	৮ বা ৩	১২
(৬) কাকপদ	+	১৬

উপরি উক্ত ষড়াঙ্গ ব্যতীত অনেকে আবার আরও দশটি অঙ্গের উল্লেখ করে অঙ্গের সংখ্যা ষোড়শটি বলে নির্ধারিত করেছেন। এই অতিরিক্ত ১০টি অঙ্গের নাম হচ্ছে যথাক্রমে

১) দ্রুত বিরাম, ২) লঘু বিরাম, ৩) লঘুদ্রুত, ৪) লঘুদ্রুত বিরাম, ৫) গুরু বিরাম, ৬) গুরু দ্রুত, ৭) গুরু দ্রুত বিরাম, ৮) প্লুত বিরাম, ৯) প্লুত দ্রুত, ১০) প্লুত দ্রুত বিরাম।

৫) **গ্রহ :** তালের যে বিশেষ মাত্রাটি থেকে সংগীতারম্ভ হয় সেই স্থানটিকেই বলা হয় গ্রহ। গ্রহ দুই ভাগে বিভক্ত—সম ও বিষম গ্রহ। বিষম গ্রহকে আবার অতীত ও অনাগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

[এই চারটি সংজ্ঞার জন্য অষ্টম অধ্যায়ে "লয়ের চতুর্গ্রহ" দ্রষ্টব্য।]

৬) **জাতি :** তালের একাধিক জাতি বর্তমান। মোট পাঁচ প্রকার জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—ত্রিশ্র, চতশ্র, খণ্ড, সংকীর্ণ এবং মিশ্র। 'সংগীতদর্পণ'-কার বলেছেন—

"চতুরস্রস্তথা ত্রস্রঃ খণ্ডোমিশ্রস্তথৈব চ।
সংকীর্ণা পঞ্চমজ্ঞেয়া জাতয়ঃ ক্রমশঃ বুধৈঃ।"

এই পাঁচটি জাতির মধ্যে চতশ্র জাতিকে ব্রাহ্মণ, ত্রিশ্র জাতিকে ক্ষত্রিয়, খণ্ড জাতিকে বৈশ্য, মিশ্র জাতিকে শূদ্র ও সংকীর্ণ জাতিকে সংকীর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পাঁচটি জাতি সম্পর্কে 'সংগীত দর্পণ'-এ উল্লেখ আছে যে ত্রিশ্র তিনবর্ণ, চতশ্র চারবর্ণ, খণ্ড পাঁচবর্ণ, মিশ্র সাতবর্ণ এবং নয়টি বর্ণের দ্বারা সংকীর্ণ জাতি হয়।

৭) **কলা :** তালের নিঃশব্দ ক্রিয়াকে বলা হয় কলা এবং ক্রিয়াকে বলে 'কলাপাত' বা 'পাতকলা'। অনেকে কলা ও তালকে সমার্থক বলেছেন। ভরত 'কলা' অর্থে বলেছেন মন্দলয়। কারণ কলানুসারে তালের গতি নির্ধারিত হত। ৮ মাত্রার এককলাবিশিষ্ট তাল দ্বি-কলায় পরিবেশিত হলে তার মাত্রা সংখ্যা হবে ১৬, চতুষ্কলায় পরিবেশিত হলে মাত্রাসংখ্যা হবে ৩২।

৮) **লয় :** বিস্তারিত আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৯) **যতি :** তালের দশ প্রাণের একটি প্রাণ হচ্ছে যতি। 'সংগীত-দর্পণ'-কার যতির সংজ্ঞা দিয়েছেন –

"লয়প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে"।

অর্থাৎ লয় প্রবৃত্তির যে নিয়ম তাকে যতি বলে।

যতি পাঁচ প্রকার—সমা, সরিৎ (স্রোতগতা), মৃদঙ্গ, ডমরু (পিপীলিকা) এবং গোপুচ্ছা।

সমা: আদি, মধ্য এবং অন্তে একই প্রকার গতি হলে তাকে বলা হয় সমা যতি।

সরিৎ: আদিতে বিলম্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুতগতিসম্পন্ন যতিকে বলা হয় সরিৎ বা স্রোতগতা যতি।

মৃদঙ্গ: আদি ও অন্তে দ্রুত এবং মধ্যে মধ্য ও দ্রুতের মিশ্রণে মৃদঙ্গা যতি হয়।

ডমরু: আদি ও অন্তে বিলম্বিত এবং মধ্যস্থানে দ্রুত গতির সমাবেশ হলে তাকে ডমরু বা পিপীলিকা যতি বলা হয়।

গোপুচ্ছা: আদিতে দ্রুত মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত গতির ক্রিয়া হলে তাকে বলা হয় গোপুচ্ছা গতি।

১০) **প্রস্তার:** প্রস্তারের অর্থ বিস্তার। প্রাচীন কালে নানাভাবে তালের প্রস্তার করা হত। যেমন 'সংগীত দামোদর'—কার তালের প্রস্তার প্লুত হতে আরম্ভ করে লঘু ও দ্রুত মাত্রায় শেষ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তার-রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বর্তমান কালে প্রাচীন কালের এই তালপ্রস্তাররীতি আর অনুসৃত হয় না।

———

পঞ্চম অধ্যায়

ঘরাণা ও বাজ

প্রত্যেক তবলা বাদকের বাদনরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে আমরা বাদন-শৈলী বলি। এই বাদন-শৈলী সৃষ্টির সম্মান এক একটি বিশেষ বংশকে দেওয়া হয় এবং তাদেরই আখ্যা দেওয়া হয় ঘরাণা বা ঘরোয়ানা। অর্থাৎ ঘরাণা অর্থে আমরা বুঝি বিশেষ একটি বংশ এবং তাদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের। সেই বিশেষ বংশের বাদন-শৈলীকেই বলা হয় বাজ বাদন-শৈলী অর্থে বাদ্যের রীতি, বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য (Style) ইত্যাদি। বিভিন্ন ঘরাণার বাদন-শৈলী বৈশিষ্ট্য দ্বারা একটি ঘরাণা হতে অপরটির পার্থক্য বোঝা যায়। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে তবলার মূল দুইটি বাজ প্রচলিত হয়—দিল্লী অথবা পশ্চিমী বাজ এবং পূরব বা পূর্বী বাজ। পশ্চিমী বাজের প্রচলন মুখ্যতঃ দিল্লী এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে এবং পূরব বাজের প্রচলন লক্ষ্ণৌ. বারাণসী ও ফরুখাবাদ অঞ্চলে। এই পাঁচটি ঘরাণা ব্যতীত অজরাড়া ঘরাণা নামে আরও একটি ঘরাণার নাম পাওয়া যায়; অর্থাৎ ভারতে মোট ছয়টি ঘরাণার বিকাশ দেখা যায় যথা—(১) দিল্লী ঘরাণা, (২) লক্ষ্ণৌ ঘরাণা, (৩) বেনারস ঘরাণা, (৪) ফরুখাবাদ ঘরাণা, (৫) পাঞ্জাব ঘরাণা এবং (৬) অজরাড়া ঘরাণা। এই ছয়টি ঘরাণা ছয়টি বাজের (Style) উদ্ভাবক। নিম্নে প্রত্যেকটি ঘরাণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাদের বাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

দিল্লী ঘরাণা: ওস্তাদ সুধার খাঁকে সর্বপ্রথম তবলা বাদন প্রচারকের সম্মান দেওয়া হয়, তিনিই ছিলেন দিল্লী ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন বলেই তার বংশধর অথবা শিষ্য-প্রশিষ্যদের বলা 'হয়' 'দিল্লীঘরাণা' এবং তার প্রবর্তিত বাজকে বলা হয় 'দিল্লী বাজ'।

সুধার খাঁর তিন পুত্র—বুগরা, খাঁ ঘসীট খাঁ, তৃতীয় পুত্রের নাম পাওয়া যায় না। এবং তিন শিষ্য-রোশন খাঁ, কল্লু খাঁ ও তুল্লন খাঁর দ্বারাই দিল্লী বাজ নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন করে নেয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এই বংশে অনেক ভারত-বিখ্যাত তবলিয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং তারা দিল্লী ঘরাণাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। বুগরা খাঁর দুই পুত্র সিতাব খাঁ ও গুলাব খাঁর মধ্যে দুজনেই তবলা বাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন সিতাব খাঁর পুত্র নজর আলি এবং পৌত্র বড়ে কালে খাঁ দিল্লী ঘরাণার প্রতিনিধিস্থানীয় তবলা বাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন বড়ে কালে খাঁর পুত্র বোলী বক্স ছিলেন ভারতবিখ্যাত তবলিয়া। নথ্ খাঁ ছিলেন বোলী বক্সের পুত্র এবং মুনীর খাঁ ছিলেন বোলী বক্সের শিষ্য। নথ্ খাঁর শিষ্য হবীবুদ্দীন খাঁ তবলা বাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন তবে মুনীর খাঁর তিন শিষ্য—আহম্মদজান থিরকুয়া, আমীর হুসেন এবং শামসুদ্দীন খাঁর মধ্যে আহম্মদজান থিরকুয়াই সর্বভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

বুগরা খাঁর অপর পুত্র গুলাব খাঁর পুত্র-প্রপৌত্রদের নাম যথাক্রমে মহম্মদ খাঁ, ছোট কালে খাঁ, গামে খাঁ এবং ইমান আলি খাঁ। সিতাব খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁর বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; তবে তার অজ্ঞাত নামা পুত্রের বংশের তিনটি নাম পাওয়া যায় - মক্কু খাঁ, বখ্সু খাঁ এবং মোদু খাঁ। বখ্সু খাঁ ও মোদু খাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের আমন্ত্রণে স্থায়ীভাবে লক্ষ্ণৌ বসবাস করেন এবং লক্ষ্ণৌ বাজ নামে এক নূতন বাদ্য-শৈলীর প্রবর্তন করেন। নিম্নে দিল্লী ঘরাণার বংশাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল।
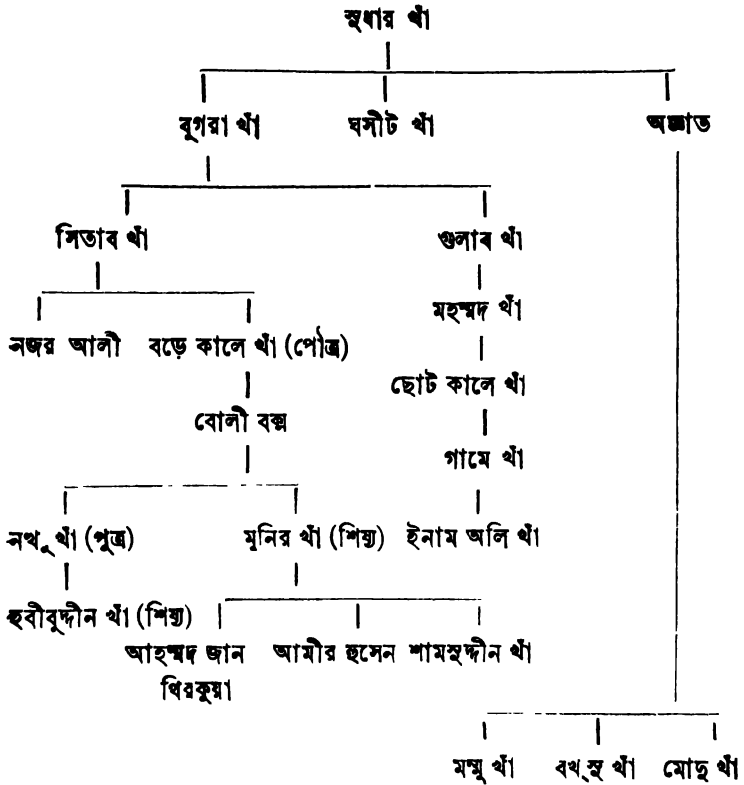
দিল্লী বাজের বৈশিষ্ট্য

১) তর্জনী এবং মধ্যমার প্রয়োগ আধিক্য আছে।

২) কিনার বা চাটীতে বোলের কাজ বেশী করা হয়। সেইজন্ত দিল্লী বাজের আর একটি নাম "কিনার কা বাজ"। এই বাজে গাবের কাজেরও প্রাধান্ত আছে।

৩) এই বাজে ছোট ছোট মুখড়া, মোহরা, কায়দা, পেশকার, রেলা ইত্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; বড় পরণ, রেলা ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় না।

৪) এই বাজে ধিন, ধিন, তেটে, তেরেকেটে, ক্রেধাতেটে, ধেনাতেটে, ধেটেতেটে ইত্যাদি বর্ণগুলি অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হয়ে থাকে।

নিয়ে দিল্লী বাজের ত্রিতালের কায়দা, টুকড়া, রেলা, লগ্গী এবং গতের উদাহরণ দেওয়া হল।

॥ কায়দা ॥

১) ধাগিতেটে তেটেধাগি তেটেধাগি দিনাকেনা
×
ধেটেতেটে ধাগিতেটে তেটেধাগ ধিনাঘেনা
২
তাকিতেটে তেটেতাকি তেটেতাক দিনাকেনা
০
ধেটেতেটে ধাগিতেটে তেটেধাগ ধিনাঘেনা
৩

২) ঘেনাতেটে ঘেনেধা— ধিন্নাঘেনা তেটেঘেনা—
×
ধাত্রেকেটেধা ঘেনাতেটে ঘেনেধাগ দিনাকেনা—

কেনাতেটে কেনেতা— দিন্নাকেনা তেটেকেনা—
০
ধাত্রেকেটেধা ঘেনাতেটে ঘেনেধাগ ধিনাঘেনা
৩

৩) ধাতেরে কেটেধে তেটে ঘেনে | নানাগেধা ত্রেকেটেদেনে
× ২
তাতেরেকেটেতা তেটেঘেনে | নানাগেধা ত্রেকেটেদেনে
০ ৩

৪) ধা ক্রেধা তেটে ধা | ত্রেকেটে দেনে দিনাকেনে
× ২
তা ক্রেতা তেটে তা | ত্রেকেটে ধেনে ধিনাঘেনে
০ ৩

॥ টুকড়া ॥

১) ধাক্রেধে তেটেধাগি তেটেধাদি নাতেটেতা—
×
দিন্‌তাতেটে কতেটেতা —ধিন্‌তা ধাক্রান—
২
ধাতেটে কতেটেতা —ধিন্‌তা ধাক্রান—
০
ধাতেটে কতেটেতা —ধিন্‌তা ধাক্রান—
৩

২) ধেটেধেটে ধাগিতেটে ক্রেধাতেটে তাকিতেটে
×
তেটেক্রেধা তেটেধাগি তেটেদিন্‌ নানাতেটে
২
ক্রেধাতেটে ধাতেৎ ধাতেটে ক্রেধাতেটে
০
ধাতেৎ ধাতেটে ক্রেধাতেটে ধাতেৎ
৩

॥ রেলা ॥

১) ধাগিনেধা –রেধা ধাঘেঘে নাকধেনে
×
ধাগিত্রেকেটে ধিনাঘেনে নাগদেনে ধিনাঘেনে
২

॥ লগ্‌গী ॥

১) ধিনাঘেনে ধাগেনধা দিনাগেনে দিনগিন
×
তিনাকেনে তাকেনতা ধাধাঘেনে ত্রেকেটেঘেনে
২

২) ঘেনাকতা ঘেঘেনাগ কেনাকতা কেকেনাগ
×

ধাধাঘেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটেদেনে দিনাকেনে
২

তাকিনেতা —ন্নেতা তাকেকে নাকদেনে
০

ধাধাঘেনে ধেনেধাগি ত্রেকেটেঘেনে ধিনাঘেনে
৩

। গৎ ।

১। ধা ঘেনান্না ঘেনা তেটে ঘেনান্না ঘেনা
×

ঘেনাতেটে ঘেঘেনাগ কেনেনাক তেনেকেনে
২

তা কেনান্না কেনা তেটে কেনান্না কেনা
০

ঘেনাতেটে ঘেঘেনাগ ঘেঘেনাগ ধেনেঘেনে
৩

২। ঘেনা ধাগিনে ধা ধাগিনে ধাত্রেকেটে ধেতেটে ঘেনে ধিনাগেনে
×

ত্রেকেটে ধেৎ ত্রেকেটে ধেৎ ধাগিনে ধেত্রেকেটে ধাতেটে কেনে দিনা কেনে
২

কেনা তাকিনে তা তাকিনে তা ত্রেকেটে তেতেটে কেনে তিনাকেনে
০

ত্রেকেটে ধেৎ ত্রেকেটে ধেৎ ধাগিনে ধা ত্রেকেটে ধেতেটে ঘেনে ধিনা ঘেনে
৩

লক্ষ্ণৌ ঘরাণা

দিল্লী ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা সুধার খাঁর দুই পৌত্র বখসু খাঁ ও মোদু খাঁ লক্ষৌয়ের নবাবের আমন্ত্রণে সেখানে যান এবং লক্ষ্ণৌ ঘরাণার পত্তন করেন। তবে মখদু বা মোদু খাঁকে অনেকে এই ঘরাণার সঙ্গে যুক্ত করতে চান না। হোসেন বখস্-এর (বখস মিঞা) পুত্র সালারে খাঁ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সালারে খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছোটে মিঞা ছিলেন গায়ক। তবে ছোটে মিঞার স্ত্রী ছোটি বিবি তবলা বাদনে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ছোটে মিঞার পুত্র বাবু খাঁ লক্ষ্ণৌ ঘরাণাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মাম্মু খাঁর দুই পুত্র খলিফা আবিদ হুসেন এবং নাদির হুসেন (ছোট্টেন খাঁ) প্রতিষ্ঠাবান তবলিয়া ছিলেন। তবে দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ আবিদ হুসেন তবলা বাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আবিদ হুসেনের শিষ্যদের মধ্যে হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী (হীরু গাঙ্গুলী), এবং জাহাঙ্গীর খাঁ সর্বভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। আবিদ হোসেনের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র খলিফা ওয়াজিদ হুসেন এবং পৌত্র আফাক হুসেনকেও লক্ষ্ণৌ ঘরাণার সার্থক প্রতিনিধি বলা চলে। ওয়াজিদ হুসেনের অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাবান তবলাবাদক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য।

॥ লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বংশাবলী ॥
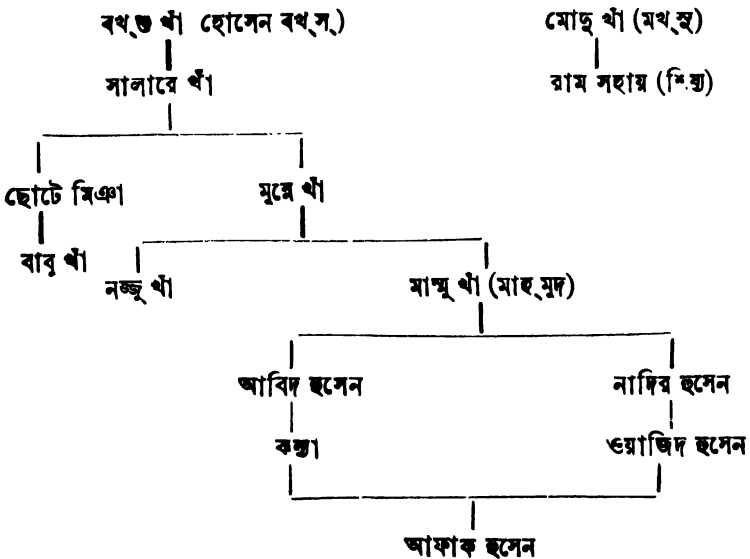
লক্ষ্ণৌ বাজের বৈশিষ্ট্য

১) নৃত্যের প্রভাবের জন্য লক্ষ্ণৌ বাজে আওয়াজ বেশ জোরদার এবং খোলা হয়।

২) লক্ষ্ণৌ বাজে কায়দা, পেশকার, রেলা ইত্যাদির প্রয়োগ হলেও টুকড়া এবং গৎ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৩) স্থর (লব) এবং গাবের (স্যাহী) কাজ অধিক প্রয়োগ করা হয়।

৪) বড় বড় পরণ এবং টুকড়া ব্যতীত দুপল্লী, তিপল্লী, চৌপল্লী গৎ, চক্রদার গৎ ইত্যাদি এই বাজে প্রাধান্য পায়।

৫) এই বাজে ধাগেতেটে, ধিন, গিন, ক্রান, ঘিড়নগ, ধিরধির ধেরেকেটে ক্রধাতেটে, ইত্যাদি বর্ণসমূহ বেশী ব্যবহৃত হয়।

৬) নাচকরণ এবং ঠুংরী গানে এই ঘরাণার বাদনশৈলী বিশেষ উপযোগী।

নিম্নে লক্ষ্ণৌ বাজের ত্রিতালের একটি টুকড়া ও লগগী দেওয়া হল :-

॥ টুকড়া ॥

ঘেন্‌ত্রেকেটে তাক্‌ তাগিতেটে কতা ঘেনা ধা
×

তুনাঘেনাতুনা ধাতুনা ধাতুনা ধাতু
২

না কতা ঘেনা তুনা ধাতুনা ধাতুনা ধাতু
০

না কতা ঘেনাতুনা ধাতৃনা ধাতুনা ধাতুনা
৩

॥ লগ্‌গী ॥

ধা ধিন্‌ ধা রা | ধা তিন্‌ না রা
× | ২

তা তিন্‌ ধা রা | ধা ধিন্‌ না রা
০ | ৩

বেনারস ঘরাণা

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার অন্যতম উদ্ভাবক মোদু খাঁর শিষ্য পণ্ডিত রামসহায় বেনারস ঘরাণার স্রষ্টিকর্তা। পণ্ডিত রামসহায় দীর্ঘ বার বৎসর লক্ষ্ণৌয়ে বখ্‌শু খাঁর ভ্রাতা মোদু খাঁর কাছে তবলা শিক্ষা করে জন্মভূমি বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেনারস ঘরাণা নামে একটি নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন। এই বংশে বেনারস ঘরাণাকে যাঁরা সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রামসহায়ের ভ্রাতা ও শিষ্য জানকী সহায়, ভ্রাতুষ্পুত্র ভৈরব সহায় এবং অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে যদুনন্দন, প্রতাপজী, ভগৎশরণ এবং বৈজুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এদেরেই যে সকল শিষ্য প্রশিষ্যমণ্ডলী দ্বারা বেনারস বাজের জয়যাত্রা এবং জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকে তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম হল বলদেও সহায়, কণ্ঠে মহারাজ, বাচা মিশ্র, মৌলবীরাম মিশ্র, বাক্ষ মিশ্র, আনোখেলাল প্রভৃতি এবং আরও পরবর্তী পর্যায়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য, কিষণ মহারাজ, নানকু মহারাজ, সামতাপ্রসাদ, মহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি।

॥ রামসহায়ের বংশাবলী ॥
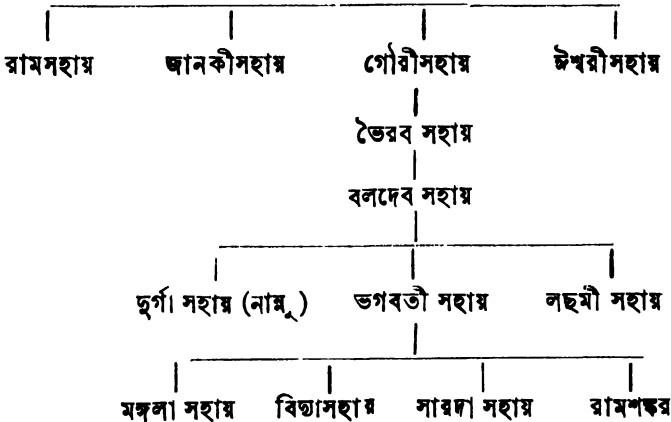
বেনারস বাজের বৈশিষ্ট্য

১) বেনারস বাজের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এতে লগ্‌গী, লড়ী, ছন্দ, গৎ ইত্যাদির প্রয়োগ-বাহুল্য আছে। এইগুলি ব্যতীত বড় বড়

পরণ কায়দা, পেশকার ইত্যাদিও যথেষ্ট বাজান হয়।

২) পাখোয়াজ—অঙ্গের বোল বা বর্ণের আধিক্য দেখা যায়।

৩) আওয়াজ গম্ভীর এবং জোরদার।

৪) থাপ, লব ও গাবের কাজ বেশী।

৫) বাঁয়ার কাজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বেনারস বাজের ত্রিতালের রেলা, টুকড়া প্রভৃতির কয়েকটি উদাহরণঃ

॥ রেলা ॥

ধা—ঘেনে ধারাঘেনে ধা-ঘেনে ধারাঘেনে
×

ধা—ঘেনে ধারাঘেনে নাকদেরে দিনাকেনে
২

তা—কেনে তারাকেনে তা—কেনে তারাকেনে
০

ধা—ঘেনে ধারাঘেনে নাকধেরে ধিনাঘেনে
৩

। টুকড়া ।

কত্তাধা দিগেনেতা ক্রেকেটেতাক্তানে তেটেকতানে
×

ধা—ক্রেধিন্ধিন ধা, ক্রেধিন্ধিন ধা, ক্রেধিনধিন
২

ধা—ক্রেধিন্ধিন ধা, ক্রেধিন্ধিন ধা, ক্রেধিন্ধিন
০

ধা—ক্রেধিনধিন ধা, ক্রেধিন্ধিন ধা, ক্রেধিন্ধিন
৩

। কায়দা ।

ধিক্ ধিনা তেটে ঘেনে | ধাগে নাতিক্—তিনাড়া
× | ২

তিক তিনা তেটে ঘেনে | ধা নাধিক্—ধিনাড়া
০ | ৩

॥ কাহারবার ২টি লগ্‌গী ॥

১) ধিগ্‌না ধি—গ্‌ ধিনাড়া | তিক্‌না ধি—গ ধিনাড়া
×　　　　　　　　o

২) তাক্‌ধেড়ে নাগনাগ নাক্‌তেড়ে নাক্‌নাক্‌
×

তাক্‌ধেড়ে নাগনাগ নাকধেড়ে নাগনাগ
o

বেনারসী ঘরাণার ত্রিতালের পুরা বাজ

আলোচ্য বিষয়টি ক্রিয়াত্মক অংশের অন্তর্গত ; কিন্তু একক (Solo) বাদনে তবলা লহরায় কিভাবে ধাপে ধাপে শিল্পী অগ্রসর হন তারই নমুনা-স্বরূপ ত্রিতালের বেনারসী বাজের নিম্নোক্ত উদাহরণটি সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে উঠান থেকে সুরু করে প্রত্যেকটি ধাপের একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গৎ, উঠান ও ফরদ্‌ ব্যতীত প্রত্যেকটি ধাপেই একাধিক পালটা বাজিয়ে লহরাকে শ্রুতিমধুর এবং বিস্তৃত করা হয়। বাহুল্যের ভয়ে পালটাগুলি আর দেওয়া হল না। ত্রিতালের পুরা বাজের এই উদাহরণটি বেনারসী ঘরাণার অন্যতম প্রতিনিধি ভারত-বিখ্যাত তবলা-বাদক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কাছে পেয়েছি।

॥ উঠান ॥

তিরিকিটি ধেৎ তিরিকিটি ধেৎ তিরিকিটি ধেৎ ধেটে ধেটে ধেটে
×

ধাগিতেধে তাগিতেটে ধাগিতেটে তাগিতেটে
২

ক্রেধাতেটে ধাগিতেটে ক্রেধায়ে ধাগিতেটে
o

ধেটেধেটে ধাগিতেটে ক্রেধাতেটে ধাগিতেটে
৩

ধাতেটে ধাতেটে তেটে দিন্‌ ধাগিনে তেটে
×

ধাতিরিকিটি ধাতেটে তেটে ধাগিতেটে তাগিতেটে
২

ধাগেন্নে তাগেন্নে ধিরিধিরিকিটিতক্ ধাতিরিকিটিতক
০

ধাতেং ধাতেং তেটে ধেং তেটে ধাগিতেটে
৩

ধাতিরিকিটিতক্ দিন্ না দিন্ তরানে
×

ধা ক্রেধনে কত ধা ক্রেধনে কত | ধা ক্রেধনে কত ধা কত ধা কত
২ ০

ধা ऽধা ক্রেধনে কত | ধা ক্রেধনে কত ধা ক্রেধনে কত
৩ ×

ধা কত ধা কত ধা ऽ | ধা ক্রেধনে কত ধা ক্রেধনে কত
২ ০

ধা ক্রেধনে কত ধা কত ধা কত | ধা
৩

॥ আমোদ ॥

ক্রান্ দিন্ তা কিটিতাক্ তিরিকিটি
×

নাক ধেং তিরিকিটি ধিরিধিরি কিটিতাক
২

ধেং ধাগেনে ধা | ধাগেনে ধা ধাগেনে | ×
০ ৩

* ছোট ছোট টুকরা বৈচিত্র্যময় তিহাইসহ বিভিন্ন স্থান থেকে সমে এসে পড়ে।

। ঠেকার পাল্টা ।

॥ ১ ॥

ধিন্ ধিন্ ধিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ না
× ২

তিন্ তিন্ তিন্ না । তেটে ধিন্ ধিন্ না
০ | ৩

॥ ২ ॥

ধিন্ না তিন্ না । তেটেধিন্ ধিন্ না
× | ২

তিন্ না ধিন্ না । তেটে ধিন্ ধিন্ না
০ | ৩

॥ কায়দা ॥

ধা তিরিকিটি ধা তেটে ধাগি । ধাগে তিন্না কিটিতাক্ তিরিকিটি
× | ২

তা তিরিকিটি তাতেটে ধাগি । ধাগে ধিন্না কিটিতাক্ তিরিকিটি
০ | ৩

॥ পাল্টা ॥

॥ ১ ॥

ধা তেটে ধাগি ধা তিরিকিটি । ধাগে তিন্ না কিটিতাক তিরিকিটি
× | ২

তা তেটে ধাগি তা তিরিকিটি । ধাগে ধিন্ না কিটিতাক তিরিকিটি
০ | ৩

॥ ২ ॥

ধাগি তেটে ধাধা তিরিকিটি । ধাগে তিন্না কিটিতাক তিরিকিটি
× | ২

ধাগি তেটে তাতা তিরিকিটি । ধাগে ধিন্না কিটিতাক তিরিকিটি
০ | ৩

॥ পেশ্কার ॥

ধিক্ধিনা তেটেধিনা । ধিগিনা তিক্তিনাড়া
× | ২

তিকতিনা তেটেতিনা । ধিগিনা ধিকধিনাড়া
০ | ৩

॥ বাঁট ॥

ধিগিনা নকিটি ধেনে | গেনে তিগিনা নকিটি
× | ২

তিগিনা নকিটি তেনে | গেনে ধিগিনা নকিটি
০ | ৩

॥ রেলা ॥

ধা—তিরি কিটতক তিরিকিটি ধা— তিরি
×

কিটতক তিরিকিটি ধা— তিরি কিটতক
২

তা— তিরিকিটতক তিরিকিটি তা তিরি
০

কিটতক তিরিকিটি ধা—তিরি কিটতক
৩

॥ গৎ ॥

ধা তেটে তেটে ধাগে তেটে তেটে ক্রেধা তেটে
×

ক্রেধাৎ দিঁ কিটতক দিন্ দিন্ তা
২

ধা তিরিকিটি ধা তেটে ধা তিঁরিকিটি ধা তেটে

দিন্ দিন্ তা ধা তিরিকিটি ধান্ কৎ তা
৩

তা তেটে তেটে তাগে তেটে তেটে ক্রেতা তেটে
×

ক্রেতাৎ তিঁ কিটতাক দিন্ দিন্ তা
২

ধা তিরিকিটি ধা তেটে ধা তিরিকিটি ধা তেটে

দিন্ দিন্‌তা ধা তিরিকিটি ধান্ কৎতা
৩

॥ ফরুদ্ ॥•

ক্রেধেৎ ধানে ক্রেধেৎ ধানে ক্রেধেৎ ধানে ধা ধাগেনে
×
ধাগেনে তাগেনে ধাগেনে তাগেনে ধাগেনে তাগেনে তা
২
ধেটেৎ ধেটেতে ধেটেৎ ধেটেতে ধেটেৎ ধেটেতে তেটে কৎ কৎ
০
তেটে কৎ কৎ তিরিকিটি তক্ ধিরিকিটি তক্ তিরিকিটি তক্
৩
তেধেৎ ধানে তেধেৎ ধানে তেধেৎ ধানে তা তাগেনে
×
তাগেনে ধাগেনে তাগেনে ধাগেনে তাগেনে ধাগেনে ধা
২
তাগেৎ ধান্ ধা তেটেৎ তেটেতে তেটেৎ তেটেতে তেটে কৎ কৎ
০
তেটে কৎ কৎ তিরিকিটিতক্ ধিরিকিটিতক্ তিরিকিটিতক্
৩

॥ চক্রদার তিহাই ॥

[তিরিকিটি ধেৎ ধাগিতেটে তাগিতেটে দিন্‌তেটে ক্রেধাতেটে কৎ
×
তেটে তিরিকিটি ধেৎ ধা— তিরিকিটি ধেৎ ধা—তিরিকিটি ধেৎ ধা—]

উপরি উক্ত অংশটুকু তিনবার বাজাতে হবে।

* জোড়া বা বিস্তার হয় না। সম্ থেকে সম্ বাজে।

ফরুখাবাদ ঘরাণা

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বখসু খাঁর জামাতা হাজী বিলায়েৎ আলী খাঁ ফরুখাবাদ ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। বিলাযেত খাঁর পুত্র (পোষ্যপুত্র?) হুসেন আলী খাঁ তবলা বাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং পরে তিনি রামপুর

দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বংশের যারা তবলিয়া হিসাবে সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হুসেন আলী খাঁর পুত্র (?) নন্‌হে খাঁ, শিষ্য মুনীর খাঁ, পৌত্র মসীত খাঁ এবং প্রপৌত্র কেরামৎ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। মতান্তরে নন্‌হে খাঁও হুসেন আলীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। মুনীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে আহমদজান থিরকুয়া সর্বভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। মসীত খাঁ সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে উস্তাদ মুন্নে খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং রাইচাঁদ বড়ালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ভারতের প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক। এই ঘরাণার আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শামসুদ্দীন খাঁ, আমীর খাঁ, গোলাম রসুল, ইমাম বক্স খাঁ, ছুন্নু খাঁ, মুবারক আলী ইত্যাদি। শেষোক্ত চারজন বিলায়েত খাঁর শিষ্য ছিলেন।

॥ ফরুখাবাদ ঘরাণার বংশতালিকা ॥

হাজী বিলায়েৎ আলী খাঁ
|
হুসেন আলী খাঁ (?)
|
নন্‌হে খাঁ (?)
|
মসীত খাঁ
|
কেরামৎ খাঁ

ফরুখাবাদ বাজের বৈশিষ্ট্য

লক্ষ্ণৌ, বেনারস এবং ফরুখাবাদ এই তিন ঘরাণার বাদনশৈলীর মধ্যে পার্থক্য খুব কমই আছে। কারণ লক্ষ্ণৌ ঘরাণা হতেই বেনারস এবং ফরুখাবাদ ঘরাণার উৎপত্তি হয়েছে। তাই এই তিনটি ঘরাণাকে পূরব বাজের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। তবে ফরুখাবাদ ঘরাণার বাদনশৈলীতে গতের চাল বিশেষ মহত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং একক বাদনে (Solo) এখানে উঠানের পরিবর্তে প্রথমে পেশকার বাজান হয়। তাছাড়া এই ঘরাণার

বোলে লয় ও স্থাহীর প্রাধান্য দেখা যায় এবং ঘেড়েনাগ, কেড়েনাগ, ঘিড়নক, দিড়নক, ধেরেধেরে, ধাতিন্ন, তাতিন্ন, ইত্যাদি বোলের আধিক্য দেখা যায়। নিম্নে এই বাজের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। উদাহরণগুলি সবই ত্রিতালে প্রযোজ্য।

॥ গৎ ॥

তাগধেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটেধেনে ধা
×
—ধেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটেদেনে কেনেতা
২
তাকতেনে কেনেতাকি ত্রেকেটেদেনে কেনেতা
০
—ধেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটেধেনে ঘেনেধা
৩

॥ চলন ॥

ধাতিধা ধাতিঘেনে ধিন্নাঘেনে ধাতিধা
×
ক্রেধেত্তা ঘেনাতেৎ ধাতিঘেনে দিন্না কেটেতাক
২
তা কেটেতাক তা কেটেতাক তাত্রেকেটেতাক তাত্রেকেটেতাক
০
ত্রেকেটেতাকতাক ত্রেকেটেধাতি ধাগিনেধা তেত্তাঘেনে
৩

॥ কায়দা ॥

ধাকেটে তাকধা ঘেড়েনাগ তেৎ
×
ধাধা ঘেড়েনাগ দিনতা কেড়েনাক
২
তাকেটে তাকতা ঘেড়েনাগ ধেৎ
০
ধাধা ঘেড়েনাগ ধিনতা ঘেড়েনাগ

॥ টুকড়া ॥

তা কেটেতাক ধি কেড়েনাগ ধেৎ ধাক্রেধা— নেধা
×
গদ্দি কত্তা ধা কেড়েনাক তেরেকেটে তাগ ধেরেধেরেকেটে
২
ধা ক্রান ধা কেড়েনাক তেরেকেটে তাগ ধেরেকেটে
০
ধা ক্রান ধা কেড়েনাগ তেরেকেটে তাগ ধেরেকেটে ধাক্রান
৩

পাঞ্জাব ঘরাণা

লক্ষ্ণৌ ঘরাণা হতে বেনারস এবং ফরুখাবাদ ঘরাণার উৎপত্তি এবং স্বয়ং লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উৎস হচ্ছে দিল্লী ঘরাণা ; তাই এই চারটি ঘরাণার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা একেবারেই পৃথক, অন্য কোনও ঘরাণার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। হুসেন বক্স পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। হুসেন বক্সের পুত্র ফকীর বক্সকেই এই বংশের শ্রেষ্ঠ তবলিয়া বলে স্বীকার করা হয়। ফকীর বক্সের শিষ্যবর্গের মধ্যে মলন খাঁ ও করম ইলাহী খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক উস্তাদ আল্লারাখা কাদির বক্সের শিষ্য।

॥ পাঞ্জাব ঘরাণার বংশতালিকা ॥
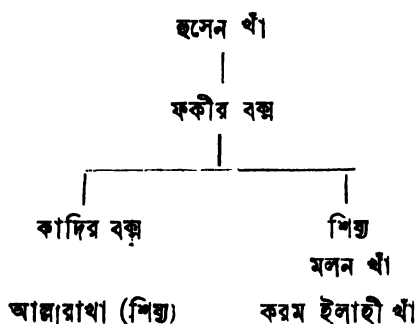
পাঞ্জাব বাজের বৈশিষ্ট্য

১) পাঞ্জাব বাজে পাখোয়াজের প্রভাব আধিক্যের জন্য এই বাজে পাখোয়াজের খোলা বোল বন্ধ বোলে রূপান্তরিত হয়েছে।

২) বড় বড় কায়দা, পেশকার, গৎ, পরণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৩) অনেকে বাঁয়ার স্যাহী (গাব) অংশে বাজাবার পূর্বে আটা বা ময়দা লাগিয়ে নেন বাঁয়ার আওয়াজকে আরও গম্ভীর করবার জন্য।

৪) বোলে পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাব আছে, যেমন—ক্রাতান, ড়ুংগে, নগ, ধাধি নাড়, গদ্দি নাড় ইত্যাদি।

॥ পাঞ্জাব বাজের উদাহরণ ॥

ত্রিতাল (দেড়িয়া ছন্দ)

ধানে ধাকেটে ধাগেনে ধা তেরেকেটে
×
ধানে তাকেটে তাঘেনে কত্তেটে
২
তাকধি না তাকধি না—
০
ক্রান্‌তা ধা ধেরেধেরেকেটেতাক তাতেরেকেটেতাক্‌
৩

অজরাড়া ঘরাণা

দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাটের একটি গ্রামের নাম অজরাড়া। এই ঘরাণার উদ্ভাবক কল্লু খাঁ এবং মীর খাঁ নামে দুই ভ্রাতা অজরাড়া গ্রামে বাস করতেন বলে তাদের ঘরাণা অজরাড়া ঘরাণা নামে সুপরিচিত। এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন সিতার খাঁর শিষ্য। তারা দিল্লীতে সিতার খাঁর কাছে তবলার তালিম নিয়ে নিজ গ্রামে এসে দিল্লী ঘরাণার কিছু হেরফের ঘটিয়ে এই নতুন ঘরাণার পত্তন করেন। এই বংশের মধ্যে তবলা বাদনে প্রসিদ্ধি অর্জন

করেছিলেন কল্লু খাঁর পুত্র মহম্মদ বখ্‌স, পৌত্র চাঁদ খাঁ এবং প্রপৌত্র কালে খাঁ। অন্যান্য সার্থক তবলিয়ার মধ্যে কালে খাঁর পুত্র হস্‌সু খাঁ, পৌত্র শম্মু খাঁ এবং প্রপৌত্র হবীবুদ্দীন খাঁয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ অজরাড়া ঘরাণার বংশতালিকা ॥
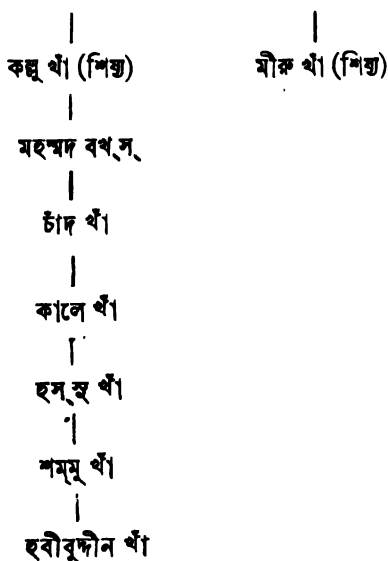
অজরাড়া বাজের বৈশিষ্ট্য

দিল্লী বাজ অজরাড়া বাজের উৎস বলে দিল্লী বাজের বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই অজরাড়া বাজে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র কায়দাগুলির অপূর্ব প্রয়োগেই এই বাজের বৈশিষ্ট্য। কারণ কায়দাগুলি সাধারণতঃ এই বাজে আড় বা দেড়িয়া লয়ে প্রয়োগেরই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া গৎ, পেশকার ইত্যাদিরও রূপ অনেকটা কায়দার মত। দিল্লী বাজের তুলনায় অজরাড়া বাজে বাঁয়ার কাজ অধিক করা হয়। নিম্নে অজরাড়া বাজের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হল।

॥ গৎ ॥

(১) ধাতেটে ধে টে ধাগেনে | ধাড়াঘেনে | ধিনাঘেনে

×

ধাতেটে ধে | টে ধাগেনে | ধাড়াঘেনে | তিনাকেনে

২

তা তেটে তে | টে তাকেনে | তাড়াকেনে | তিনাকেনে

০

ধা তেটে ধে | টে ধাগেনে | ধাড়া ঘেনে | ধিনা ঘেনে

৩

(২) ধিন্ ধিনাঘেনে ধাগি তেরেকেটে ধাতে ঘেঘেনাগ ধেনে ধিনাঘেনে

×

ধাগিনে ধাতেৎ ধেতেটে ধাগিনে ধাতে ঘেঘেনাগ দেন দিনাকেনে

২

তিন্ তিনাকেনে তাকি তেরেকেটে ধাতে ঘেঘেনাগ দেনেদিনাকেনে

০

ধাগিনে ধাতেৎ ধাতেটে ধাগিনে ধাতে ঘেঘেনাগ ধেনে ধিনাঘেনে

৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি

৭টি প্রাথমিক তাল এবং তাদের জাতি

কর্ণাটকী বা দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে প্রধান হচ্ছে সাতটি তাল, যথা—(১) ধ্রুবতাল, (২) মঠতাল, (৩) রূপকতাল (৪) ঝম্পতাল, (৫) ত্রিপুটতাল, (৬) অঠতাল এবং (৭) একতাল।

এক বা একাধিক মাত্রা বোঝাবার জন্য কর্ণাটকী তালগুলিতে ছয় প্রকার অঙ্গের জন্য ছয় প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। নিম্নে অঙ্গগুলির নামসহ মাত্রা সংখ্যা ও সাংকেতিক চিহ্নগুলি দেওয়া হল।

অঙ্গের নাম	মাত্রা সংখ্যা	চিহ্ন
অনুদ্রুতম্	১	◡
দ্রুতম্	২	o
লঘু	৪	I
গুরু	৮	S
প্লুতম্	১২	ꣿ
কাকপদম্	১৬	×

কর্ণাটকী তালে প্রথম তিনটি অঙ্গের (অনুদ্রুত, দ্রুত এবং লঘু) চিহ্ন ব্যবহৃত হয় শেষ তিনটি অঙ্গের চিহ্ন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না।

'পঞ্চজাতি ভেদ' অনুসারে উপরিউক্ত সাতটি তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি হলে মোট জাতির সংখ্যা হবে ৭ × ৫ = ৩৫।

পঞ্চজাতির নাম যথাক্রমে তিস্রম্, চতস্রম্, খণ্ডম্, মিশ্রম্ এবং সংকীর্ণম্। 'পঞ্চজাতি-ভেদ' অনুসারে লঘুর মাত্রা পরিবর্তিত হয়েই উপর্যুক্ত পাঁচটি জাতি সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—

(১) তিস্র জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা = ৩
(২) চতস্রজাতিতে " " = ৪
(৩) খণ্ডজাতিতে " " = ৫
(৪) মিশ্রজাতিতে " " = ৭
(৫) সংকীর্ণজাতিতে " " = ৯

॥ ৭টি তালের ৩৫ প্রকার জাতির তালিকা ॥

তাল	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
ধ্রুবতাল	তিস্র	1011	৩+২+৩+৩=১১
	চতস্র	1011	৪+২+৪+৪=১৪
	মিশ্র	1011	৭+২+৭+৭=২৩
	খণ্ড	1011	৫+২+৫+৫=১৭
	সংকীর্ণ	1011	৯+২+৯+৯=২৯
মঠতাল	তিস্র	101	৩+২+৩=৮
	চতস্র	101	৪+২+৪=১০
	মিশ্র	101	৭+২+৭=১৬
	খণ্ড	101	৫+২+৫=১২
	সংকীর্ণ	101	৯+২+৯=২০
রূপক তাল	তিস্র	10	৩+২=৫
	চতস্র	10	৪+২=৬
	মিশ্র	10	৭+২=৯
	খণ্ড	10	৫+২=৭
	সংকীর্ণ	10	৯+২=১১

তাল	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
ঝম্প	তিস্র	1⌣0	৩+১+২=৬
	চতস্র	1⌣0	৪+১+২=৭
	মিশ্র	1⌣0	৭+১+২=১০
	খণ্ড	1⌣0	৫×১+২=৮
	সংকীর্ণ	1⌣0	৯+১+২=১২
ত্রিপুট তাল	তিস্র	100	৩+২+২=৭
	চতস্র	100	৪+২+২=৮
	মিশ্র	100	৭+২+২=১১
	খণ্ড	100	৫+২+২=৯
	সংকীর্ণ	100	৯+২+২=১৩
অঠ তাল	তিস্র	1100	৩+৩+২+২=১০
	চতস্র	1100	৪+৪+২+২=১২
	মিশ্র	1100	৭+৭+২+২=১৮
	খণ্ড	1100	৫+৫+২+২=১৪
	সংকীর্ণ	1100	৯+৯+২+২=২২
একতাল	তিস্র	1	৩
	চতস্র	1	৪
	মিশ্র	1	৭
	খণ্ড	1	৫
	সংকীর্ণ	1	৯

উপরের তালিকায় লক্ষ্যণীয় এই যে প্রতিটি তালে বিভিন্ন জাতিতে তালচিহ্ন একই থাকলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই লঘুর (।) মাত্রাসংখ্যার পরিবর্তনের জন্যই মাত্রা সংখ্যার হেরফের ঘটেছে। লঘু ব্যতীত অন্যান্য চিহ্নের মাত্রাসংখ্যাগুলি অপরিবর্তিত থাকছে।

উপরিউক্ত ৩৫ প্রকারের প্রত্যেকটির আবার ৫টি করে উপবিভাগ আছে; অতএব এই হিসাবে মোট তালের সংখ্যা হবে ৩৫ × ৫ = ১৭৫টি। অর্থাৎ ৭টি তালের পঞ্চ জাতির প্রত্যেকটিতে ৫টি করে উপবিভাগ হলে প্রত্যেকটি তালের মোট প্রকার হবে ৫ × ৫ = ২৫। এই হিসাবে মোট ৭টি তালের ২৫ × ৭ = ১৭৫টি প্রকার হবে। নিম্নে ত্রিপুটতালের ২৫ প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হল।

॥ ত্রিপুট তালের ২৫ প্রকার ॥

জাতি চিহ্ন মাত্রা	জাতি-ভেদ	গতিভেদানুসারে			মোট মাত্রা
তিস্র ··100 ···৭	তিস্র ·· · ·····৭	×	৩	=	২১
	চতস্র ···········৭	×	৪	=	২৮
	খণ্ড·········,···৭	×	৫	=	৩৫
	মিশ্র ·············৭	×	৭	=	৪৯
	সংকীর্ণ.······ · ৭	×	৯	=	৬৩
চতস্র···100 ···৮	তিস্র·········,·· ৮	×	৩	=	২৪
	চতস্র ··········৮	×	৪	=	৩২
	খণ্ড ·········.৮	×	৫	=	৪০
	মিশ্র ········. ৮	×	৭	=	৫৬
	সংকীর্ণ·······,···৮	×	৯	=	৭২
মিশ্র···100··· ১১	তিস্র ···········১১	×	৩	=	৩৩
	চতস্র·············১১	×	৪	=	৪৪
	খণ্ড ···········.১১	×	৫	=	৫৫
	মিশ্র ············১১	×	৭	=	৭৭
	সংকীর্ণ······,···১১	×	৯	=	৯৯

জাতি	চিহ্ন	মাত্রা	গতি-ভেদ	গতিভেদানুসারে মোট মাত্রা
খণ্ড	100	৯	তিস্র	৯ × ৩ = ২৭
			চতস্র	৯ × ৪ = ৩৬
			মিশ্র	৯ × ৭ = ৬৩
			খণ্ড	৯ × ৫ = ৪৫
			সংকীর্ণ	৯ × ৯ = ৮১
সংকীর্ণ	100	১৩	তিস্র	১৩ × ৩ = ৩৯
			চতস্র	১৩ × ৪ = ৫২
			মিশ্র	১৩ × ৭ = ৯১
			খণ্ড	১৩ × ৫ = ৬৫
			সংকীর্ণ	১৩ × ৯ = ১১৭

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(১) সাতটি তাল মুখ্য।

(২) প্রতিটি তালের পাঁচটি করে জাতি এবং মোট জাতির সংখ্যা ৩৫।

(৩) প্রত্যেক জাতির আবার পাঁচটি করে বিভাগ নিয়ে মোট ১৭৫ প্রকার তাল উৎপন্ন হতে পারে।

(৪) সব তালই সম হতে আরম্ভ হয় এবং যতগুলি চিহ্ন তত সংখ্যক তালি হবে।

(৫) খালি বা ফাঁক নেই, তবে খালির অনুরূপ 'বিসর্জিতম' আছে।

(৬) জাতিভেদ অনুসারে লঘুর মাত্রা পরিবর্তিত হয়।

কর্ণাটকী তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে লিখন

নিম্নে ৫টি জাতিতে ধ্রুবতাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে দেখান হল।—

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১১ (1101) ত্রিস্রজাতি ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১৪ (1011) চতস্রজাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ২৩ (1001) মিশ্র জাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ |
× | ২ | ৩ |

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
৪ ০

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১৭ (1001) খণ্ডজাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ | ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ২৮ (1011) সংকীর্ণজাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ | ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ |
× | ২ | ৩

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮
৪

উপরি উক্ত নিয়মে প্রত্যেকটি কর্ণাটকী তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে লেখা চলবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে লঘুর মাত্রানুযায়ী একই তালের বিভিন্ন জাতিতে মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয় এবং তাল বিভাগও সেই নিয়মে করা হয়েছে।

হিন্দুস্থানীতাল কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখন

হিন্দুস্থানী তালগুলিকে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে খালি বা ফাঁকের বিভাগ পূর্ববর্তী তালিয় বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে

হবে, কারণ আমরা পূর্বে বলেছি যে কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে খালি বা ফাঁক নেই। নিম্নে কয়েকটি হিন্দুস্থানী তাল ঠেকা সহ কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখে দেখান হল।

॥ চৌতাল, মাত্রা ১২ (1100) ৪টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
×				২				৩		৪	

॥ সুলতাল, ১০ মাত্রা (101) ৩টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা	তিট	কত	গদি	ঘেনে
×				২		৩			

॥ আড়া চৌতাল, মাত্রা ১৪ (0111) ৪টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধা	ত্রেকেটে	ধি	না	তু	না	ক	ত্তা	ত্রেকেটে	ধি	না	ধি	ধি	না
×		২				৩				৪			

॥ ত্রিতাল, ১৬ মাত্রা (ISI), তিনটি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	না	তিন্	তিন্	না	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা
×				২								৩			

অন্য মতে হিন্দুস্থানী তালকে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখতে হলে হিন্দুস্থানী তাল যতগুলি বিভাগ-সমন্বিত হবে সবগুলি বিভাগই দেখাতে হবে। নিম্নে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় মতানুযায়ী কয়েকটি হিন্দুস্থানী তাল কর্ণাটকী পদ্ধতিতে কেবলমাত্র চিহ্ন-সহযোগে লিখে দেখান হল।—

তাল	প্রথম মত	দ্বিতীয় মত
আড়া চৌতাল	0111	000000
ঝাঁপতাল	0 1 0	01000 0
ধামার	011	1 001
ত্রিতাল	ISI	1111

কর্ণাটকী তালের মুখ্য চার বিষয়

উত্তর ভারতীয় তাল-পদ্ধতি হতে কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি জটিল। প্রাচীন কর্ণাটকী ১০৮ প্রকার তাল পদ্ধতি থেকে মুখ্য ৭টি তাল এবং প্রতি তালের পঞ্চজাতি ভেদ অনুসারে ৩৫টি তাল সৃষ্টি হয়েছে। এই ৩৫টির আবার পাঁচটি করে বিভাগ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৫টি। তবে এই তাল পদ্ধতি যতই জটিল হোক এর চারটি প্রধান বিষয় উল্লেখযোগ্য, যথা— কাল বা প্রমাণ, অঙ্গ, জাতি এবং বিসর্জিতম্

কাল বা প্রমাণ : সঙ্গীতে ব্যবহৃত সময়কে কাল বা প্রমাণ বলে। সময়কে বিভিন্ন মাত্রাদ্বারা নিবদ্ধ করে তালের কাঠামো গঠিত হয়। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে সময়কে পরিমাপ করবার জন্য দুইটি পদ্ধতির প্রচলন আছে, যথা— মাত্রা এবং অক্ষরকাল। ৪ মাত্রা=১ অক্ষরকাল। বর্তমানে অক্ষরকাল কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে প্রচলিত।

অঙ্গ : তাল বিভাগকেই কর্ণাটকী পদ্ধতিতে অঙ্গ বলা হয় এবং অঙ্গের সংখ্যা ছয়টি—অনুদ্রুতম্; দ্রুতম, লঘু, গুরু, প্লুতম্ এবং কাকপদম্। প্রত্যেকটির মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১,২,৪,৮, ১২ এবং ১৬।

জাতি : তালের মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে। জাতির সংখ্যা পাঁচটি ত্রিস্রম, চতুস্রম, মিশ্রম্, খণ্ডম এবং সংকীর্ণম্। বিভিন্ন জাতির লঘুর মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে ত্রিস্রমে ৩. চতুস্রমে ৪. মিশ্রমে ৭, খণ্ডমে ৫ এবং সংকীর্ণমে হয় ৯। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লঘু ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গের মাত্রাসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

বিসর্জিতম : কর্ণাটকী পদ্ধতিতে ফাঁককে বলা হয় বিসর্জিতম্ বা বিচ্‌চে এবং তালাঘাতকে বলা হয় আতি। দ্রুত অঙ্গের দ্বিতীয় মাত্রায় বিসর্জিতম্ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বিসর্জিতম্ তিন প্রকার, যথা—পতাকম, কৃষম্ন এবং সর্পিনী।

পতাকম্—হস্ত ঊর্ধাভিমুখী করা; কৃষয়—বামদিকে হস্ত প্রদর্শন এবং সর্পিনী—দক্ষিণদিকে হস্ত প্রদর্শন।

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি	উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতি
১) প্রধান তাল বাদ্য মৃদঙ্গম।	১; প্রধান তাল বাদ্য তবলা।
২) সংগতকার হিসাবে বাদকের কিছু প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ গানের মাঝে মৃদঙ্গবাদককেও তার কলাকৌশল প্রয়োগের তথা স্বাধীনভাবে বাজাবার সুযোগ দেওয়া হয়।	২) সংগতকারের কোন স্বাধীনতা থাকে না। তবে তন্ত্রবাদ্যে তবলাবাদকের যোগ্যতা প্রদর্শনের কিছুটা সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।
৩) কর্ণাটকীতালে বিভাগ নেই, সবই অঙ্গ বলা হয়।	৩) হিন্দুস্থানী তালে অঙ্গের পরিবর্তে বিভাগ মানা হয়।
৪) প্রতিটি অঙ্গেই তালি, খালি নেই।	৪) বিভাগাদিতে তালি ও খালি দুইই আছে।
৫) একমাত্রার এক একটি অঙ্গ বা বিভাগ হতে পারে।	৫) প্রচলিত তালাদির বিভাগগুলিতে কমপক্ষে দুইটি মাত্রা থাকে।
৬) প্রধান সাতটি তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি আছে।	৬) জাতিভেদ নেই।
৭) খালি নেই, তবে এর অনুরূপ বিসর্জিতম আছে।	৭) বিসর্জিতমের অনুরূপ খালি বা ফাঁক আছে।
৮) অঙ্গের শেষ মাত্রাটিতে বিসর্জিতমের নির্দেশ থাকে	৮) খালির বিভাগের প্রথম মাত্রায় খালির চিহ্ন দেওয়া হয়।
৯) তাল সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে।	৯) তাল সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই।
১০) তালপদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত।	১০) উত্তর ভারতীয় তালপদ্ধতি কর্ণাটকী পদ্ধতির মত এত শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়।

সপ্তম অধ্যায়

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ দোষ

তবলা বাদনে সফলতা অর্জন করতে হলে একদিকে যেমন কতকগুলি গুণের অধিকারী হতে হবে অন্যদিকে তেমনই দোষগুলি পরিহার করতে হবে। নিম্নে তবলা বাদকের গুণ ও দোষগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ

১) হৃদ্য শব্দ : যার বোল বা বর্ণগুলি সুস্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুর।

২) সুসম্প্রদায় : যিনি গুরু-পরম্পরায় উচ্চ শ্রেণীর বাদক।

৩) ক্রিয়াপর : নিয়মিত অভ্যাস করে যিনি হস্তকৌশল উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন।

৪) সর্বগুণ সমন্বিত : যার বাদন পদ্ধতি ত্রুটিহীন।

৫) ধারণান্বিত : যার ধারণাশক্তি তথা স্মৃতিশক্তি প্রখর।

৬) লয়দার : যিনি বিশেষরূপে লয়ে পারদর্শী।

৭) উন্মেষশালী : যিনি বাদ্যকালে প্রয়োজন মত নতুন সৃষ্টিকার্যে সক্ষম।

৮) জিতশ্রম : যিনি অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন না।

৯) তালজ্ঞ : তাল সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

১০) সতর্ক : যিনি সতর্কতার সঙ্গে বাদ্য পরিবেশন করেন।

১১) লোককান্ত : যার বাদন-শৈলী বা বাদন-কৌশলে জনচিত্ত মুগ্ধ হয়।

১২) পরিমিত : যিনি সংগতের সময় প্রয়োজনমত ছোট বা বড় কায়দা, রেলা ইত্যাদির প্রয়োগ করেন।

১৩) শোভন : যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন এবং কোনরূপ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করেন না।

১৪) প্রসন্ন : যিনি সদা প্রসন্ন অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই বিরক্ত হন না।

১৫) পণ্ডিত : ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াত্মক অংশে যার সমান দক্ষতা।

১৬) সর্বসঙ্গত পারদর্শী : যিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যে সমভাবে সঙ্গতে পারদর্শী।

১৭) ত্রিগুণাধিকারী : যিনি বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান এবং জ্ঞানান্বেষী।

১৮) বাদ্য বিষয় কৌশলী : বাদনে সকল বিষয়ে যার দক্ষতা আছে — অর্থাৎ যিনি সকল কৌশল সম্বন্ধে অবহিত।

১৯) নির্মাণ শিল্পজ্ঞ : তবলা বাঁয়ার গঠন কার্য্য সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে।

২০) স্বরজ্ঞ : যিনি সঠিক সুরে তবলা বাঁধতে পারেন।

২১) বাদ্যেত্তর সঙ্গীতনিপুণ : সংগীতের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে যার কিছু জ্ঞান আছে।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের দোষ

১) কুণ্ঠিত অঙ্গুলী : যিনি অঙ্গুলী সহজভাবে প্রয়োগ করেন না।

২) অশোভন : যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন না।

৩) সন্ত্রস্তচিত্ত সংগতি : যিনি সন্ত্রস্তচিত্তে সংগত করেন।

৪) বেলয়ী : যার লয় অসমান।

৫) নিরস বাদক : যার বাদ্য কর্কশ, শ্রুতিমধুর নয়।

৬) সুস্পষ্টহীন : যার বর্ণ বা বোলগুলি অস্পষ্ট।

৭) অশ্রুতপ্রায় ধ্বনি : যার আওয়াজ স্পষ্ট এবং জোরদার নয়।

৮) তাল প্রক্রিয়াহীন : যিনি তালাদির প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন।

৯) নিমীলিত চক্ষুবাদক : যিনি নিমীলিত চক্ষে বাজান।

১০) অনাবিষ্ট বাদক : যিনি তালবৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে পারেন না।

১১) চঞ্চলচিত্ত : বাদ্যে তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না।

১২) বেসুর : যার সুরজ্ঞান নেই।

১৩) অপরিমিতি বোদ্ধা : যার পরিমিতি-বোধের অভাব।

১৪) অপ্রসন্নচিত্ত বাদক : যিনি অপ্রসন্নচিত্তে বাজান।

১৫) স্বেচ্ছাচারী : যিনি নিয়ম-কানুন মানেন না।

১৬) সুসম্প্রদায় হীন : যিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তালিম নেন নি।

১৭) অকৃতবিদ্য সঙ্গতকার : যিনি সংগীতের সর্ববিভাগে সংগতে অপারগ।

১৮) কুসঙ্গতি : যিনি উত্তম সংগতকার নন।

'সংগীতদর্পণ'-কার সংক্ষেপে বাদকের নিম্নলিখিত গুণ দোষ নির্দেশ করেছেন, যথা : হস্তকোন প্রহারজ্ঞ, গীতবাদ্যে সুপণ্ডিত, লয়তাল কলাভিজ্ঞ, সম, তাল ইত্যাদি গ্রহণক্ষম, পাটজ্ঞ ধ্বনিতত্ত্ববিদ, গীতবাদন তত্ত্বানুসন্ধি, দোষাচ্ছাদনপটু, গ্রহমোক্ষস্থানাভিজ্ঞ, গীতনৃত্য প্রমাণবিৎ এবং নাদ, বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত উত্তম বাদক বলে পরিচিত এবং এই কয়েকটি গুণহীন হলে তাকে অধম বাদক বলা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

লয়, লয়ের প্রকার ও লয়কারী

লয় : সংগীতে যা গতির সমতা রক্ষা করে তাকে বলা হয় লয়। 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে লয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে

"ক্রিয়ান্তর বিশ্রান্তিলয় :।"

অর্থাৎ লয় হচ্ছে ক্রিয়ার অন্তে বিশ্রান্তি।—

'অমর কোষ' গ্রন্থে গীতবাদ্যের পদাভ্যন্তরে ক্রিয়া এবং কালের-পরস্পরের সমতাকে লয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

"গীত বাদ্য পাদন্যাসাণং ক্রিয়াকালোয় পরস্পরং সমতা লয়।" সংগীত এবং লয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ লয়হীন সংগীত প্রাণহীন।

লয়ের চতুর্গ্রহ : লয়ের চারটি গ্রহ আছে, যথা : সম, অতীত, অনাগত এবং বিষম।

সম : "গীতাদিসমকালস্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ" [সংগীত-দর্পণ]। অর্থাৎ গীতাদির সমকালীন যে তাল তাকে সমগ্রহ বলে। এটি সমপাণিক। পাণি অর্থে তাল।

অতীত : "গীতাদৌবিহিতে পশ্চাৎতাল বৃত্তিবিধীয়তে।

অতীতাখ্যো গ্রহোজ্ঞেয়ঃ-সোহবপাণিরিতিস্মৃত :"॥ [সংগীতদর্পণ]

পূর্বে গীত আরম্ভ হলে পর যেখানে তাল দেওয়া হয় তাকে অতীত গ্রহ বলে। এটি অবপাণিক।

অনাগত : "পূর্বং তালপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎপশ্চাদগীতাদিরুচ্যতে।

অনাগতঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স এবোপরিপাণিকঃ॥" [সংগীত দর্পণ]

পূর্বে তাল দেওয়া হলে পর যদি গান আরম্ভ হয় তাহলে তাকে অনাগত বলে। এটি উপরিপাণিক।

বিষম : "আদ্যং তয়োরনিয়মো বিষমগ্রহ শব্দভাক্।

গীত মধ্যাবসানেষু প্রয়োগং সূক্ষমাচরেৎ॥" [সংগীতদর্পণ]

গীত এবং তালের যদি প্রথম অনিয়ম হয়, পরে মধ্যে এবং শেষে যদি সুষমভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে বিষমগ্রহ বলে।

লয়ের রূপ ও প্রকার

গতির পরিমাপ অনুসারে লয়কে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা: দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত। তবে সংগীতে গতির প্রকার নিয়ে নানা মত আছে। কোন মতে দ্রুত, মধ্য বিলম্বিত অংশের মধ্যে আবার তিনটি করে উপবিভাগ আছে। 'সংগীতরত্নাকর'কার ছয় প্রকার গতির উল্লেখ করেছেন, যথা: দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত দ্রুত, মধ্য দ্রুত, বিলম্বিত এবং মধ্য বিলম্বিত। পাশ্চাত্য সংগীতেও ছয় প্রকার গতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা:

১। Auegro—দ্রুত, ২। Adanta—মধ্য; ৩। Zargo—বিলম্বিত, ৪। Presto—দ্রুত মধ্য; ৫। Vino—দ্রুত বিলম্বিত এবং ৬। Moderato—মধ্য বিলম্বিত।

বিভিন্ন লয়ের সময় অর্থাৎ স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'সংগীত তরঙ্গ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"একে দ্রুত, দুয়ে মধ্য, তিনে বিলম্বিত।" সাধারণভাবে বিলম্বিত লয়ের দ্বিগুণকে মধ্যলয় এবং মধ্যলয়ের দ্বিগুণকে দ্রুতলয় হিসাবে ধরা হয়।

বর্তমানে রূপ ও প্রকার অনুসারে লয়কে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: অতি-বিলম্বিত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, এবং অনুদ্রুত লয়। তাছাড়া লয়ের গতির রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়ি, কুআড়ি, বিআড়ি লয় বলা হয়। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার লয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

অতিবিলম্বিত: মন্থরতর গতিকে বলা হয় অতিবিলম্বিত লয়। যেমন বিলম্বিত লয়ের প্রতিটি মাত্রার স্থায়িত্বকাল যদি ২ সেকেণ্ড হয়, তাহলে অতি-বিলম্বিত লয়ের প্রতিটি মাত্রায় স্থায়িত্বকাল হবে ৪ সেকেণ্ড।

বিলম্বিত: মন্থর গতিকে বলা ঢিমা হয় বা বিলম্বিত লয়। সাধারণতঃ মধ্যলয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি মাত্রায় ২ সেকেণ্ড পরিমাণমত সময়কে বিলম্বিত লয়ের স্থায়িত্বকাল ধরা হয়।

মধ্য: সহজ এবং স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে মধ্যলয় এবং প্রতি মাত্রায় ১ সেকেণ্ড পরিমাণ মত সময় এর স্থায়িত্বকাল ধরা হয়।

দ্রুত: জলদ বা ত্বরিৎগতিসম্পন্ন লয়কে বলা হয় দ্রুতলয় এবং বর্তমানে প্রতি মাত্রায় ·১/২ সেকেণ্ড পরিমাণ মত সময় দ্রুতলয়ের স্থায়িত্বকাল বলে নির্দেশ করা হয়।

অনুদ্রুত: অতি জলদ বা অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন লয়কে বলা হয় অনুদ্রুত লয়। দ্রুত লয়ের দ্বিগুণ গতিতে অনুদ্রুত লয় বাজান হয়, অর্থাৎ অনুদ্রুত লয়ে প্রতিটি মাত্রার স্থায়িত্বকাল ১।৪ সেকেণ্ড সময় মাত্র।

দ্বিগুণ: যে সময়ের মধ্যে একটি মাত্রা স্বর বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত হয় সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের মধ্যে দুইটি মাত্রা, স্বর বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় দ্বিগুণ লয়, যেমন:

সংখ্যা:				
একগুণ—	১	২	৩	৪
দ্বিগুণ	১২	৩৪	১২	৩৪

বর্ণ:				
একগুণ—	ধা	ধিন	ধিন	ধা
দ্বিগুণ—	ধাধিন	ধিনধা	ধাধিন	ধিনধা

তিনগুণ: নির্দিষ্ট একটি মাত্রার সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রা, স্বর বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত হলে তিনগুণ লয় বলা হয়; যেমন—

একগুণ:—	সংখ্যা—	১	২	৩
	বর্ণ—	ধা	ধি	না
তিনগুণ:	সংখ্যা -	১২৩	১২৩	১২৩
	বর্ণ—	ধাধিনা	ধাধিনা	ধাধিনা

চৌগুণ: যে সময়ের মধ্যে একটি মাত্রা, বর্ণ বা স্বর বাজান বা উচ্চারিত হয়, সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চারটি মাত্রা, বর্ণ

বা স্বর বাজান বা উচ্চারণ করাকে বলা হয় চৌগুণ লয়, যেমন—

একগুণ :	সংখ্যা—	১	২	৩	৪
	বর্ণ—	ধা	ধি	না	ধি
চারগুণ :	সংখ্যা—	১২৩৪	১২৩৪	১২৩৪	১২৩৪
	বর্ণ	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি

আড়ি : দেড়গুণ গতির ছন্দ অর্থাৎ নির্দিষ্ট দুই মাত্রা সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রা অথবা এক মাত্রার স্থায়িত্বকালের মধ্যেই দেড় মাত্রার প্রয়োগ হলে বলা হয় আড়ি লয়, যথা :

একগুণ :	সংখ্যা—	১	২	৩	৪
	বর্ণ—	ধা	ধি	না	তি
দেড়গুণ :	সংখ্যা—	১s২	s৩s	ss৫	s৬s
	বর্ণ—	ধাsধি	sনাs	তিsধা	sধিs

কুআড়ি : সোয়াগুণ গতির ছন্দ অর্থাৎ চার মাত্রা সময়ের মধ্যে পাঁচটি মাত্রার প্রয়োগ ($\frac{৫}{৪}$) হলে তাকে বলা হয় কুআড়ি লয়, যথা :

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
বর্ণ :	ধা	ধি	ধি	না
সংখ্যা :	১৪s২	sss৩s	ss৪ss	s৫sss
বর্ণ :	ধাssধি	sssধিs	ssধিss	sনাsss

আবার চারমাত্রা সময়ের মধ্যে ৯ মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় কুআড়ি লয়, যথা :

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
বর্ণ :	ধা	ধি	ধি	না
সংখ্যা :	১sss২sss৩	sss৪sss৫	ss৬sss৭ss	s৮sss৯sss
বর্ণ :	ধাsssধিsssধি	sssনাsssধা	sssধিsssধিss	sনাsssধাsss

বর্তমানে প্রথমোক্ত প্রকারটি (৫/৪) প্রচলনই সর্বাধিক এবং দ্বিতীয় প্রকারটি (৯/৪) অপ্রচলিত।

বিআড়ি : পৌনে দুই গতির ছন্দ অর্থাৎ আট-এর সাতাশগুণ (২৭/৮) অথবা সাতের চারগুণ (৭/৪) লয়কে বলা হয় বিআড়ি লয়। অর্থাৎ এই লয়ে আটমাত্রা সময়ের মধ্যে সাতাশ মাত্রা অথবা চার মাত্রা সময়ের মধ্যে সাত মাত্রার প্রয়োগ হয়ে থাকে। বর্তমানে দ্বিতীয় প্রকারটির (৭/৪) প্রচলন অধিক, তাই নিম্নে দ্বিতীয় প্রকারটির উদাহরণ দেওয়া হল।—

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
	১SSS২SS	S. SSS৪S	SS৫SSS৬	SSS৭SSS
বর্ণ :	তি	না	ধি	না
	তিSSSনাSS	SধিSSSনাS	SSতিSSSনা	SSSধিSS

লয়কারী বা ছন্দ

লয়কারী অর্থ লয় বৈচিত্র্য এবং লঘু গুরু স্বর বা মাত্রার নিয়মবিশিষ্ট বর্ণ যোজনার নাম ছন্দ। সংগীতে ছন্দই হচ্ছে তাল। লয়কারীতে একটি লয়কে বিভিন্ন ছন্দে রূপায়িত করে প্রয়োগ করা হয়। এই ছন্দান্তর দ্বারা আলঙ্কারিক ক্রিয়াগুলির অভিনবত্ব আনয়ন করা হয়। ছন্দ পরিবর্তন না করলে অর্থাৎ একই ছন্দে গতায়াত করলে তা হবে বৈচিত্র্যহীন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন·

"ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরও বাড়ে।"

ছন্দ দুই প্রকার—সম ও বিষম। বিষম ছন্দের দ্বারাই ছন্দবৈচিত্র্যক্রিয়া সাধিত হয়। বিষম ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে—তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি আর এক অংশে বাধা, এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তাহার নৃত্য · এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হইত, তাহা হইলে ছন্দ হইত না;

এ কেবল বাধার ছল এতে গতিকে আরও উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্রময় করে তোলে। এইজন্য অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রায় ছন্দের গতিকে যেন আরও বেশী অনুভব করা যায়।"

সমভাবে বা যুগ্মভাবে গঠিত স্বর, বর্ণ বা মাত্রা সমাবেশকে বলা হয় সমছন্দ এবং অযুগ্ম স্বর, বর্ণ বা মাত্রা সমাবেশকে বলা হয় বিষম ছন্দ। সমছন্দে গতি হয় সরল, বিষম ছন্দে বক্র। দুইগুণ, চারগুণ, আটগুণ, ইত্যাদি সমছন্দের উদাহরণ এবং বিষম ছন্দের পাঁচটি বিভাগ, যথা: আড়ি, কুআড়ি, বিআড়ি, দম ও থম।

"সঙ্গীতে ছন্দবৈচিত্র্য আনয়ন হয় নিম্নলিখিত ক্রিয়াদ্বারা, যথা গতি পরিবর্তন, তালাঘাত পরিবর্তন মাত্রার বিরাম অথবা অক্ষর উচ্চারণের স্থায়িত্ব এবং স্বর বা বোলের প্রবল উচ্চারণভঙ্গী। সঙ্গীতে ছন্দের গতি পরিবর্তন বহুভাবে করা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ সোওয়া, দেড়ী, পৌনে দুই ও দুইগুণ গতির ব্যবহারই বেশী হয়, অনেক ক্ষেত্রে উক্ত গতিগুলি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও হয়। যেমন সোয়ার দ্বিগুন আড়াইয়া, চতুর্গুণ পাঁচ; এই প্রকার দেড়ীর দ্বিগুণ তিন, চতুর্গুণ ছয়, পৌনে দুই এর দ্বিগুণ সাড়ে তিন, চতুর্গুণ সাত, দুই-এর দ্বিগুণ চার, চতুর্গুণ আট (আটগুণকে অনেকে পরছন বলেন)।" [ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ – সুবোধ নন্দী, পৃঃ ১৪—১৫]।

লয়কারী লিখবার নিয়ম

দ্বিগুণ, তিনগুণ লয়কারী লেখা সহজ, কিন্তু ভগ্নাংশ হলে অর্থাৎ ১০/৯, ২/৩, ৩/৪, ৪/৩, ইত্যাদি ক্ষেত্রে লয়কারী লিখবার একটি সহজ নিয়ম উল্লিখিত হল।

প্রথমতঃ যত গুণের, লয়কারী লিখতে হবে সেই অংকের উপরের সংখ্যাটির (লব) একক হতে সেই সংখ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটির সঙ্গে নিম্নের সংখ্যার (হর) একটি কম [অর্থাৎ ৩ হলে ২টি করে, ৫ হলে ৪টি করে] অবগ্রহ যুক্ত করতে হবে। তারপর মোট সংখ্যাকে নীচের সংখ্যাটি দ্বারা (হর) ভাগ দিলে নির্ণেয় লয়কারী বের হবে

উদাহরণ:

$\frac{৪}{৩}$ গুণ অর্থাৎ তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ দেখাতে হলে—

উপরের সংখ্যাটি (লব)=৪

অতএব ১ হতে ৪ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে নিম্নের সংখ্যা (হর) ৩ হতে একটি কম (৩—১=২) অর্থাৎ দুইটি করে অবগ্রহ (ऽ) যুক্ত করলে সংখ্যা এবং অবগ্রহ নিয়ে মোট হবে ১২টি। যথা:

১ऽऽ ২ऽऽ ৩ऽऽ ৪ऽऽ।

এইবার ৩ (হর) দ্বারা ১২কে বিভক্ত করলে প্রতিটি বিভাগের সংখ্যা এবং অবগ্রহ নিয়ে মোট ৪টি করে হবে।

১	২	৩
১ऽऽ২	ऽऽ৩ऽ	ऽ৪ऽऽ

∴ ৩ মাত্রার প্রয়োগের মধ্যে ৪ মাত্রার প্রয়োগ হল।

লয়কারীর কয়েকটি উদাহরণ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা মাত্রার পরিমাণ এবং বর্ণের পূর্বে বা পরে অবগ্রহ (S) প্রয়োগ দ্বারা মাত্রা সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটান হয়েছে।

দুইয়ের তিন গুণ ($\frac{২}{৩}$): তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে দুই মাত্রার প্রয়োগ করা হলে বলা হয় দুয়ের তিনগুণ $\frac{২}{৩}$।

১	২	৩
১ऽ	ऽ২	ऽऽ

তিনের চারগুণ ($\frac{৩}{৪}$) বা পৌনগুণ: চারমাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে তিন মাত্রার প্রয়োগ করা হলে তাকে বলা হয় তিনের-চারগুণ ($\frac{৩}{৪}$) বা পৌনগুণ। উপরি উক্ত নিয়ম অনুসরণ করে চারটি মাত্রার প্রতিটির

সঙ্গে দুইটি করে অবগ্রহ (ঽ) সংযুক্ত করে যে চারটি মাত্রা হবে তাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনের চারগুণ (৩/৪) লিখতে হবে।

১ ২ ৩ ৪

ঽ ঽ ঽ ঽ ২ ঽ ঽ ঽ ৩ ঽ ঽ ঽ

ধা ঽ ঽ ঽ ধি ঽ ঽ ঽ না ঽ ঽ ঽ

চারের তিন গুণ (৪/৩): তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ হয়। উপরিউক্ত নিয়মে—

১ ২ ৩

১ ঽ ঽ ২ ঽ ঽ ৩ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ

ধা ঽ ঽ বি ঽ ঽ ধি ঽ ঽ না ঽ ঽ

চারের পাঁচগুণ (৪/৫) : পাঁচটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চারটি মাত্রার প্রয়োগ হয়। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫

১ ঽ ঽ ঽ ঽ ২ ঽ ঽ ঽ ঽ ৩ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ৪ ঽ ঽ

ধা ঽ ঽ ঽ ঽ ধি ঽ ঽ ঽ ঽ ধি ঽ ঽ ঽ ঽ না ঽ ঽ ঽ ঽ

চারের সাতগুণ (৪/৭): সাত মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ হয়। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ ঽ ঽ ঽ ৪ ঽ ঽ ঽ ২ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ৩ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ৪ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ

ধা ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ধি ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ধি ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ না ঽ ঽ ঽ ঽ ৪ ঽ

ছয়ের চারগুণ (৬/৪) : চার মাত্রা প্রয়োগ সময়ের মধ্যে ছয় মাত্রার প্রয়োগ হবে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪

১ ঽ ঽ ঽ ২ ঽ ঽ ঽ ৩ ঽ ঽ ঽ ৪ ঽ ঽ ঽ ৫ ঽ ঽ ঽ ৬ ঽ ঽ ঽ

ধাঽঽঽধিঽ ঽঽনাঽঽঽ নাঽঽঽতি ঽঽনাঽঽঽ

একনজরে লয়ের বিভিন্ন প্রকার

একগুণ	১	২	৩	৪			
দুইগুণ	১,২	৩,৪	৫,৬	৭,৮			
তিনগুণ	১,২,৩	৪,৫,৬	৭,৮,৯	১০,১১,১২			
চারগুণ	১,২,৩,৪	৫,৬৭,৮	৯,১০,১১,১২	১৩,১৪,১৫,১৬			
সওয়াগুণ (কুয়াড়ি)	১	২	৩	৪	৫		
দেড়গুণ (আড়ি)	১	২	৩	৪	৫	৬	
পৌণে দুগুণ (বিআড়ি)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

গাণিতিক পদ্ধতিতে লয়কারী আরম্ভের স্থান নির্ণয়

পূর্বে বিভিন্ন মাত্রার লয়কারী লিখবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এইবার আমরা লয়কারী আরম্ভ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যাযুক্ত তালগুলির কোন মাত্রা হতে লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দুইগুণ, তিনগুণ কিংবা চারগুণ ইত্যাদি লয়কারীর ক্ষেত্রে অনেকে বিশেষ তালটিকে দুইবার, তিনবার এবং চারবার করে লিখে দেখান যা শাস্ত্রসম্মত নয়। সেই জন্য প্রতিটি লয়কারীর কাজ এখানে এক আবর্তনের মধ্যেই দেখান হয়েছে।

লয়কারী আরম্ভের স্থান নির্ণয় করতে গেলে দুইটি বিষয় জানতে হবে :—

১) নির্দেশ তালটির মাত্রাসংখ্যা এবং

(২) কতগুণের লয়কারী।

নির্দেশ তালটির মাত্রাসংখ্যাকে যত গুণের লয়কারীতে দেখাতে হবে সেই সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ দিলে পাওয়া যাবে মোট কত মাত্রার মধ্যে তালটির লয়কারী সমাপ্ত হবে এবং যত মাত্রার মধ্যে লয়কারীর কাজ শেষ হবে সেই সংখ্যাটিকে তালের মাত্রা সংখ্যা হতে বিয়োগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তারপর থেকেই লয়কারী সুরু হবে।

যেমন, একটি ১০ মাত্রাসংখ্যা সম্পন্ন তালকে $১\frac{১}{২}$ গুণ করলে কত মাত্রার মধ্যে এক আবর্তনে লয়কারীর কাজ শেষ করা যাবে ?

$$১০ \div ১\frac{১}{২} = ১০ \times \frac{২}{৩} = \frac{২০}{৩} = ৬\frac{২}{৩}$$

∵ $৬\frac{২}{৩}$ মাত্রার মধ্যে তালটির দেড়গুণ লয়কারীর কাজ শেষ হবে। ১০ থেকে (নির্দেয় তালটির মাত্রাসংখ্যা) এই সংখ্যাটি অর্থাৎ $৬\frac{২}{৩}$ কে বিয়োগ করলে কত মাত্রার পর থেকে নির্দিষ্ট লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে সেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন—

$$১০ - ৬\frac{২}{৩} = ৩\frac{১}{৩}$$

∵ $৩\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে ১০ মাত্রার তাংলর দেড়গুণ লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪১৪ ২S৩ ৪৪৪ S৪৬ S৭S ৮S৯ S১০৪ ।

নিম্নে উপরিউক্ত হিসাবানুসারে ১৬ মাত্রার তালকে বিভিন্ন লয়কারীতে লিখতে হলে কতমাত্রা থেকে আরম্ভ করতে হবে তা দেখান হল।

দুইগুণ : $১৬ - \frac{১৬}{২} = ৮$

∵ ৯-মাত্রা থেকে দুইগুণ আরম্ভ করতে হবে। ১৬—৮=৮ মাত্রার মধ্যে দুইগুণ সমাপ্ত হবে।

তিনগুণ : $১৬ - \frac{১৬}{৩} = ১০\frac{২}{৩}$

∵ $১০\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর থেকে তিনগুন আরম্ভ হবে এবং $১৬ - ১০\frac{২}{৩}$ (অথবা ১৬÷৬)= $৫\frac{১}{৩}$ মধ্যে তিনগুণ সমাপ্ত হবে

চারগুণ : $১৬ - \frac{১৬}{৪} = ১২$

∵ ১৩ মাত্রা হতে চারগুণ আরম্ভ হবে। ১৬—১২=৪ মাত্রায় মধ্যে চারগুণ সমাপ্ত হবে।

আড়লয় : ১৬−(১৬ × $\frac{২}{১}$) = ৫$\frac{১}{৩}$

∵ ৫$\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে আড়লয় আরম্ভ হবে। ১৬− ৫$\frac{১}{৩}$ = ১০$\frac{২}{৩}$ মাত্রার মধ্যে আড়লয় সমাপ্ত হবে।

কুআড় লয় : ১৬−(১৬$\frac{৪}{৫}$) = ৩$\frac{১}{৫}$

∵ ৩$\frac{১}{৫}$ মাত্রার পর থেকে কুআড় লয় আরম্ভ হবে। ১৬−৩$\frac{১}{৫}$ = ১২$\frac{৭}{৫}$ মাত্রার মধ্যে কুআড় লয় সমাপ্ত হবে।

বিআড় লয় : ১৬−(১৬ × $\frac{৪}{৭}$) = ৬$\frac{৬}{৭}$

∵ ৬$\frac{৬}{৭}$ মাত্রার পর থেকে বিআড় লয় আরম্ভ হবে। ১৩$\frac{৬}{৭}$− ৬ = ৬$\frac{৬}{৭}$ মাত্রার মধ্যে বিআড় লয় সমাপ্ত হবে।

নবম অধ্যায়

তাললিপি

তবলার বর্ণগুলিকে যথাযথভাবে মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি নির্দেশপূর্বক লিপিবদ্ধ করাকে বলা হয় তাললিপি। গানের স্বরলিপির সাহায্যে যেমন নির্ভুলভাবে গান শেখা যায়; সেইপ্রকার তাললিপির সাহায্যে যে কোনও তাল নির্ভুলভাবে আরম্ভ করা যায়। তাই শিক্ষার্থীর পক্ষে তাললিপির জ্ঞান নিতান্ত অপরিহার্য।

তাললিপি লিপিবদ্ধ করবার একাধিক পদ্ধতি আছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে—ভাতখণ্ডে পদ্ধতি ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ভাতখণ্ডে পদ্ধতি অধিকতর সরল ব;ল এইটি বহুল প্রচলিত। নিম্নে পৃথক ভাবে দুইটি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হল।

ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি

(১) একমাত্রায় একটি বর্ণ হলে কোনও চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। যেমন, ধা ধি ধি না। এখানে চার মাত্রার চারটি বর্ণ আছে, তাই কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয়নি।

(২) এক মাত্রার মধ্যে একাধিক বর্ণের সমাবেশ ঘটলে বর্ণগুলির নীচে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন (‿) দেওয়া হয়, যেমন এক মাত্রার মধ্যে দুইটি বর্ণ—ধাধি, চারটি বর্ণ—ধাধিধিনা।

(৩) একমাত্রার অতিরিক্ত স্থায়িত্বকাল নির্দেশ করবার জন্য ড্যাশ চিহ্ন (—) বা 'ঽ'-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(৪) নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি, সম, খালি বা ফাঁক এবং বিভাগ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় :—

সম = × ; খালি বা ফাঁক = ০ এবং বিভাগ।

(৫) সম্ (x) ব্যতীত অন্যান্য তালির স্থানগুলি বর্ণের নীচে সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয়, যেমন ত্রিতালে সম ব্যতীত ২ (৫মাত্রায়) ও ৩ (১৩ মাত্রায়) সংখ্যাদ্বয়ের দ্বারা বুঝতে হবে যে ত্রিতালে মোট তালির সংখ্যা হবে ৩টি।

বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি

(১) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ভগ্নাংশ এবং পূর্ণমাত্রা বোঝাবার জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন :

$\frac{১}{৮}$	মাত্রার	চিহ্ন	◡◡
$\frac{১}{১৬}$	,,	,,	◡◡ ◡◡
$\frac{১}{৪}$	,,	,,	◡
$\frac{১}{৩}$	,,	,,	◡◡
$\frac{১}{২}$	,,	,,	o
১	,,	,,	—
২	,,	,,	S
৪	,,	,,	×

(২) নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি সম, খালি বা ফাঁকের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন :

সম্—১ ; খালি বা ফাঁক – +

(৩) সমের অতিরিক্ত যে যে মাত্রার তালি হবে সেই মাত্রার নিম্নে তারই সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়। নিম্নে এই পদ্ধতিতে সুরফাঁক তালটি লিখে দেখান হল। এই তালটিতে ১, ৪ এবং ৭ মাত্রায় তালি।

ধা ধা দিন্ তা কি ট ধা কি ট ত ক গ দি গ ন
— — — — o o — o o o o o o o o
১ + ৪ ৭ +

আর একটি উদাহরণ :

একতাল—মাত্রা ১২ (১, ৪, ৯, ১১ মাত্রায় তালি)

ধিন্ ধিন্ ধা গে তেরেকেটে তু না ক ত্তা ধা গে তেরেকেটে ধি না।
— — o o ‿‿‿‿ — — — — o o‿ ‿‿‿— —
১ ৪ + ৯ ১১

পাশ্চাত্য তাললিপি পদ্ধতি

পাশ্চাত্য দেশে তাল বা মাত্রাকে সময় (Time) হিসাবে ধরা হয়। এই সময়কে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—(১) সরল সময় (Simple Time) এবং মিশ্র সময় (Compound Time)। বিভিন্ন ছন্দানুসারে সরল সময়কে (Simple time) আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(১) সিম্পল্ ডুপ্ল্ টাইম (Simple Duple Time)

বা

ডাব্ল্ মেজার (Double Measure)—২/২ ছন্দ।

(২) সিম্পল্ ট্রিপ্ল্ মেজার (Simple Triple Measure)—৩/৩ ছন্দ।

(৩) সিম্পল কোয়াড্রুপ্ল্ মেজার (Simple Quadruple Measure)—৪/৪ ছন্দ।

ডুপ্ল এবং কোয়াড্রুপ্ল্কে (Duple and Quadruple) কখনও কখনও কমন টাইমও (Common Time) বলা হয়।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে তাল বিভাগের মত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও সময় বিভাগ করা হয় একটি দণ্ডের (|) মত রেখার সাহায্যে এবং ওই রেখাটিকে বলা হয় (Bar)। একই রচনায় (Composition) প্রত্যেকটি বারের (Bar) স্থায়িত্ব অর্থাৎ সময়কাল সমান। তাই কোন সুর আরম্ভের

প্রথমেই অর্থাৎ Key Signature-এর ঠিক পরেই বারের সময় নির্দেশক দুইটি সংখ্যা থাকে এবং এই সংখ্যা দুইটিকেই বলা হয় Time Signature। এই সংখ্যা দুইটির একটি উপরে এবং একটি নীচে থাকে, যেমন—$\frac{২}{৪}$। নিম্নস্থ সংখ্যাটি স্বরের প্রতীক, উপরস্থ সংখ্যাটি একটি বারের অন্তর্গত স্বর সংখ্যার নির্দেশক। "The under figure represents a note, the upper shows how many such notes there are in a bar", [Elements of Music—F. Devenport, P. 32]। উপরি উক্ত তিনটি সরল সময়ের মিলিত রূপকে বলা হয় মিশ্র সময় বা Compound Time।

"The time signature is therefore expressed by figures, showing how many notes next in value—i.e., quavers—there in the bar $\frac{6}{8}$. Such a time is called "Compound". [Elements of Music—F. Devenport, P. 33].

মিশ্র সময়ে (Compound time) দুইটি সংখ্যার উপরের সংখ্যাটি সরল সময়ের (Simpie time) সংখ্যাটি অপেক্ষা তিনগুণ হয় এবং নিম্নস্থ সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন—

ডুপ্‌ল্‌ টাইম (Duple Time)

সরল					মিশ্র				
২	২	২	২	২	৬	৬	৬	৬	৬
২	৪	৮	১৬	৩২	২	৪	৮	১৬	৩২

ট্রিপ্‌ল্‌ টাইম (Triple Time)

৩	৩	৩	৩	৩	৯	৯	৯	৯	৯
৩	৪	৮	১৬	৩২	৩	৪	৮	১৬	৩২

কোয়াড্রুপ্‌ল টাইম (Quadruple Time)

৪	৪	৪	৪	৪	১২	১২	১২	১২	১২
২	৪	৮	১৬	৩২	২	৪	৮	১৬	৩২

প্রত্যেকটি স্বরের স্থায়িত্বের সময়ানুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন আছে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রাসম্পন্ন স্বরটিকে বলা হয় সেমিব্রিভ (Semibreve)। নিম্নে একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।

নাম	মাত্রা সংখ্যা	চিহ্ন
১) সেমিব্রিভ (Semibreve)	=১ ………………	
২) মিনিম (Minim)	=১/২ ………………	
৩) ক্রচেট (Cortchet)	=১/৪ ………………	
৪) কোয়েভার (Quaver)	=১/৮ ………………	
৫) সেমিকোয়েভার (Semiquaver)	=১/১৬ ………	
৬) ডেমিসেমিকোয়েভার (Demisemiquaver)	=১/৩২	
৭) সেমিডেমিসেমিকোয়েভার (Semidemisemiquaver)	=১/৬৪	

অর্থাৎ ১টি সেমিব্রিভ=২টি মিনিম=৪টি ক্রচেট=৮টি কোয়েভার =১৬টি সেমিকোয়েভার=৩২টি ডেমিসেমিকোয়েভার=৬৪টি সেমি-ডেমিসেমিকোয়েভার।

আকারমাত্রিক তাললিপি পদ্ধতি

(১) বাণীর স্থায়িত্বজ্ঞাপক সঙ্কেত বা মাত্রাচিহ্ন বাণীর উপরিভাগে বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে দেওয়া হয়। যেমন: একমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে |); দুইমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে ||), তিনমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে |||); চারমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে ||||); অর্ধমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে ৺), সিকিমাত্রা—ধা (ধা-র উপরে ×) ইত্যাদি। ৺=অর্ধমাত্রা এবং ×=সিকি মাত্রা।

(২) বিরামনির্দেশ হয় করা ড্যাস (—) চিহ্নের দ্বারা, যেমন ধা— (উপরে | |) অর্থাৎ ধা বাজিয়ে একমাত্রা কাল বিরাম।

(৩) সমের চিহ্ন "+" এবং ফাঁকের চিহ্ন "O"। ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা তালির নির্দেশক।

(৪) তালাদিতে সমের পর ৩, ০, ১ ইত্যাদি প্রকারে চিহ্ন দেওয়া হয় এবং এইগুলি ঠেকার উপরিভাগে থাকে, যেমন—ত্রিতালে।

+				৩				০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা ।	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা ।	না	তিন্	তিন্	না ।	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

(৫) '।' চিহ্ন দ্বারা ছেদ এবং '।।' চিহ্ন দ্বারা বিচ্ছেদ বোঝান হয়।

(৬) একমাত্রা সময়ের মধ্যে সমকাল স্থায়ী দুই কিংবা তার বেশী বাণী বোঝাতে হলে '⌐¬' দেওয়া যেমন - ধা ধা,।

ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণু দিগম্বর তাললিপির পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

ভাতখণ্ডে পদ্ধতি	বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি
১) এক মাত্রায় একটি বর্ণ হলে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।	১) পূর্ণমাত্রা অথবা ভগ্নাংশ সবকিছুই বোঝাতে পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
২) সমের চিহ্ন—'+' এবং খালি বা ফাঁকের চিহ্ন 'o'।	২) সমের চিহ্ন—'১' এবং খালি বা ফাঁকের চিহ্ন—'+'।
৩) সমকে ১ সংখ্যা ধরে পরবর্তী তালের চিহ্ন ক্রমানুসারে দেওয়া হয়।	৩) যে মাত্রায় তালি হবে সেই মাত্রার নিম্নে তারই সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়।
৪) 'I' চিহ্ন দ্বারা তালের বিভাগাদি প্রদর্শিত হয়।	৪) তাল বিভাগে কোনও চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

তাললিপির সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

বিভিন্ন তাললিপির অনুধাবন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোনও পদ্ধতিই ক্রটীশূন্য নয়, অর্থাৎ তাললিপিকে এখনও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক-করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন যে তালাদিতে সম, তালি, খালি ইত্যাদির নির্দেশ করে সেগুলিকে জটিল করবার প্রয়োজন আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, '...আমাদের সংগীতে নিয়ম আছে যে যেমন—তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়।" তাই প্রচলিত কোন তালপদ্ধতিকে তিনি অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আবার তিনি বলেছেন, "...তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়।"

সম ফাঁকের বিষয় বাদ দিলেও দেখা যায় যে প্রচলিত তাললিপি পদ্ধতিগুলি সংগীতের অন্যান্য শাখার মত অগ্রসর হয়নি। পঃ ভাতখণ্ডে এবং প. বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপিকে অনেক উন্নত মানে উত্তীর্ণ করেছেন এ কথা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি ক্রটীমুক্ত নয়। তাল সম বা বিষম যাই হোক না কেন তাতে সম বা সম—এর চিহ্ন রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে গীত বাদ্য বা নৃত্যের যে বিশেষ স্থানগুলিতে ঝোঁক পড়ে তা সমের দ্বারাই বোঝান হয়ে থাকে। যাই হোক আমাদের মনে হয় পাশ্চাত্য তাললিপির আদর্শে উপর্যুক্ত দুইটি তাললিপি পদ্ধতিকে একীকরণ করে একটি আদর্শ তাললিপি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অসম্ভব কিছু নয়।

উভয় পদ্ধতির গুণ ও দোষ

ভাতখণ্ডে পদ্ধতি

গুণ: (১) তাললিখন পদ্ধতিতে কোন জটিলতা নেই।

(২) তালচিহ্ন কিংবা অন্যান্য চিহ্নাদির বাহুল্য নেই।

(৩) তালের বিভাগাদি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়।

(৪) তালির চিহ্ন সমকে ১ সংখ্যা ধরে ক্রমানুসারে দেওয়া হয়।

দোষ : (১) তালের ভগ্নাংশ মাত্রাদি নির্দেশের কোন ব্যবস্থা নেই।

(২) একাধিক ফাঁক থাকলে তালির মত সেগুলি ক্রমানুসারে নির্দেশের কোনও ব্যবস্থা নেই, কেবলমাত্র ফাকের চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হয়।

(৩) তালগুলিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা হয়নি।

(৪) তালাদির বোল বা ঠেকার বাণীর বিভিন্নতা অনেক সময়েই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিভ্রান্তিকারক বলে মনে হয়।

(৫) একক বাদন পদ্ধতির কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী নেই। বিভিন্ন ঘরাণায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(৬) একাধিক তালের মাত্রাসংখ্যা, তালি, খালি ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ আছে।

(৭) অনেক তালেরই নামকরণ অর্থহীন প্রতীয়মান হয়।

বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি

গুণ : (১) প্রথম মাত্রাটি সম ধরে তার চিহ্ন ও '১' দেওয়া হয়।

(২) পরবর্তী তালিগুলির চিহ্ন যে সংখ্যায় তালি পড়বে নিয়ে সেই সংখ্যাটিই লেখা হয়, যেমন ৪ মাত্রায় তালি পড়লে ৪, ৬ মাত্রায় তালি পড়লে ৬ ইত্যাদি।

(৩) ভগ্নাংশ মাত্রাদি নির্দেশের চিহ্নাদির সাহায্যে তাললিখন পদ্ধতি আরও উন্নত হয়েছে।

দোষ : (১) তাললিখন পদ্ধতি কিছুটা জটিল।

(২) তালির চিহ্ন তথা সংখ্যাগুলি ক্রমানুসারী নয়।

(৩) বোলের উপরিভাগে তালের মাত্রানুযায়ী সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে লেখা হয় না।

(৪) একক বাদন পদ্ধতির কোনও ধরাবাধা নিয়ম নেই।

(৫) তালবিভাগে কোনও চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

ঐতিহ্যের ধারক বা বাহকের মধ্যে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এর কারণ এই মনে হয় যে তাঁর তবলা শিক্ষা বা সংগ্রহ যথেষ্ট থাকলেও তিনি সংগতের বা ক্রিয়াশীল শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেনারস ঘরাণার উদ্ভাবক এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক রামসহায়ের গুরুরূপে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন।

পর্ব্বত সিং

১৮৭৯ সালের কোন সময়ে গোয়ালিয়রে পর্বত সিং-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সুখদেব সিংহ। কদৌ সিং-এর সঙ্গে পর্ব্বত সিংএর আত্মীয়তা ছিল এবং তৎকালীন গোয়ালিয়র দরবারের গুণী পাখোয়াজী জোরাবর সিং-এর তিনি পৌত্র ছিলেন। পিতার কাছেই তাঁর প্রথম তালিম সুরু হয়। তাঁর পিতাও একজন নামী পাখোয়াজী ছিলেন। শৈশব থেকেই পিতার সঙ্গে পর্বত সিং নানা সংগীতাসরে গিয়ে ওস্তাদদের গান-বাজনা শুনতেন। এইভাবে পিতার সঙ্গে একদিন দরবারে গিয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে মহারাজকে মুগ্ধ করেন এবং পুরস্কৃত হন। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র নয়-দশ বছর। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বাই চলে যান এবং অচিরেই সংগীত-গুণী মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। প্রায় ১৫ বছর তিনি বোম্বাইতে ছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁকে দরবারের মৃদঙ্গ—বাদকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯২৬ সালে 'ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডল"-এর সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁকে "বিদ্যা-কলা-বিশারদ" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর পুত্র মাধব সিংও পিতার তত্ত্বাবধানে পাখোয়াজ বাদনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৫১ সালের ১৮ই জুলাই গোয়ালিয়রেই পর্ব্বত সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রামসহায়

১৮৩০ সালে বারাণসীর কবীর চৌরা অঞ্চলে রামসহায়ের জন্ম হয়। তবে তাদের আদি নিবাস ছিল জৌনপুরের গোপালপুর গ্রামে। রামসহায়ের পিতাই প্রথম বারাণসীতে বসবাস সুরু করেন। শৈশব থেকেই রামসহায়ের প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। তাঁর পিতৃব্য নিজেই একজন তবলাবাদক

ছিলেন, সুতরাং রামসহায়ের তবলা-শিক্ষার হাতেখড়ি হয় পিতৃব্যের কাছেই। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার গুণে মাত্র ৯ বছর বয়সেই বারাণসীর সংগীতসমাজে তিনি উচ্চমানের তবলাবাদক হিসাবে নিজেই একটি স্থান করে নিলেন। এই সময়েই কোন একটি আসরে তাঁর বাজনা শুনে বখ্‌সু খাঁয়ের ভ্রাতা মোদু বা মখ্‌সু খাঁ মোহিত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে রামসহায়কে শিষ্যত্বে বরণ করেন। মোদু খাঁ নিজে একজন উচ্চমানের সঙ্গতিয়া না হলেও তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল অপরিমিত। প্রায় বার বছর তাঁর শিক্ষাধীনে থেকে রামসহায় গুরুর সবকিছুই আয়ত্ত করে নেন।

এই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহ। নবাব একজন সংগীতপ্রেমী ছিলেন এবং তাঁর দরবার সংগীতগুণীদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। নবাব ওয়াজিদ আলী একবার সাতদিনব্যাপী এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং এই অনুষ্ঠানে ভারতবিখ্যাত অন্যান্য গুণীর সঙ্গে রামসহায়ও আমন্ত্রিত হলেন। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র ১৭-১৮ বছর। এই অনুষ্ঠানে রামসহায় অসাধারণ গুণপনা দেখিয়ে নবাবকে চমৎকৃত করলেন এবং তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতিও পেলেন। নবাব তাঁকে সর্বসমক্ষে বহুমূল্য পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। কিন্তু এই ঘটনায় মোদু খাঁ নিন্দিত হলেন তাঁর স্বধর্মীদের কাছে এই অপরাধে যে তিনি একজন হিন্দু ছাত্রকে ঘরের বিদ্যা দান করেছেন। তখন বেগতিক দেখে মোদু খাঁ গুরুদক্ষিণা হিসাবে রামসহায়ের কাছে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে ভবিষ্যতে তাঁর দেওয়া বিদ্যা তিনি আর কাউকে শেখাতে পারবেন না। অতঃপর রামসহায় লক্ষ্ণৌ থেকে বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই প্রতিশ্রুতির জন্যই পরবর্তীকালে অসাধারণ প্রতিভাশালী রামসহায়ের শিল্পীমানস উদ্বোধিত হয় নতুন সৃষ্টির নেশায়। বালির বাঁধ দিয়ে যে বিপুল জলোচ্ছ্বাস রোধ করা যায় না এই সত্য মোদু খাঁ বুঝতে পারেননি কারণ তিনি তাঁর শিষ্যের প্রতিভায় অবমূল্যায়ন করেছিলেন। যাই হোক এর পর রামসহায় এক অভিনব তবলা বাদনরীতি প্রবর্তন করলেন যা অল্পকাল মধ্যেই 'বেনারস ঘরাণা' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করল। তাঁর প্রবর্তিত বাজে নানা ছন্দ বৈচিত্র্যের সঙ্গে তিনি গণেশ পরণ, কৃষ্ণ পরণ, কালী পরণ, শঙ্কর পরণ, দুর্গাপরণ, চক্রদার পরণ, রাসলীলা পরণ, সিদ্ধ পরণ ইত্যাদি

বহু প্রকার পরণ সৃষ্টি করেন। তিনি এক বিরাট শিষ্যমণ্ডলী তৈরী করেছিলেন যা উত্তরকালে মহীরুহের আকার ধারণ করে সারা ভারত আচ্ছাদিত করেছে।

কণ্ঠে মহারাজ

১৮৮০ সালে বারাণসীর এক সংস্কৃতিবান পরিবারে কণ্ঠে মহারাজের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তবলা বাদনে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। বারাণসী ঘরাণার প্রবর্তক পণ্ডিত রামসহায়জীর প্রপৌত্র পণ্ডিত বলদেব সহায় কণ্ঠে মহারাজের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা এবং আন্তরিকতা দেখে তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে নেন। এইভাবে ৭।৮ বছর থেকেই নিয়মিতভাবে কণ্ঠে মহারাজের শিক্ষা-পর্ব সুরু হয় এবং একাদিক্রমে প্রায় ২২।৩২ বছর তিনি গুরুর সযত্ন তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর শিক্ষাকালের মধ্যেই গুরু বলদেব সহায়জী নেপাল দরবারে নিযুক্ত হয়ে নেপাল চলে যান। কণ্ঠে মহারাজও গুরুর বিচ্ছেদে কাতর হয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে নেপালে গিয়ে হাজির হন। শিষ্যের এই শ্রমসহিষ্ণুতা দর্শনে প্রীত গুরু নিজের• বিদ্যা উজাড় করে শিষ্যকে প্রদান করেন। কণ্ঠে মহারাজও কঠিন পরিশ্রম করে সাধনার দ্বারা গুরু প্রদত্ত সকল কিছুই সম্যকভাবে অধিগত করেন দিনে ১৭।১৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে তার তর্জনী ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও তিনি সমানভাবে রিয়াজ করেছেন। এই অসামান্য ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠার জন্য তবলাবাদক হিসাবে শীঘ্রই তার নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ সংগীত নাটক আকাদেমী তাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন।

তার ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কিষণ মহারাজ ইতিমধ্যেই সর্বভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তার অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর গাঙ্গুলী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাদন-শৈলী : কণ্ঠে মহারাজের বাদন-শৈলীর মধ্যে বেনারস ঘরাণারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তবে নিজ প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জন্য বিভিন্ন

লয়কারীর কাজ, গৎ, পরণ ইত্যাদির অধিকতর সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি ছিলেন পারদর্শী।

হবীবুদ্দীন খাঁ

উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ ১৮৯১ সালে মীরাট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশ অজরাড়া ঘরাণার প্রতিনিধি-স্থানীয় বলে পরিগণিত হত। কল্লু খাঁ এবং মীরু খাঁ প্রতিষ্ঠিত অজরাড়া ঘরাণার তবলা বাদকদের মধ্যে উস্তাদ চাঁদ খাঁ, কালে খাঁ, হসসু খাঁ ইত্যাদি সুবিখ্যাত ছিলেন। হসসু খাঁয়ের পুত্র শম্মু খাঁ এবং শম্মু খাঁয়ের পুত্র হবীবুদ্দীন খাঁ। হবীবুদ্দীনের পিতা শম্মু খাঁ এই ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া ছিলেন।

১২ বৎসর হতে তিনি পিতার কাছে তালিম নেওয়া আরম্ভ করেন এবং মাত্র চার বৎসর পিতার কাছে তার শিক্ষার সুযোগ হয়। ১৯১৫ সালে পিতার মৃত্যু হলে হবীবুদ্দীনের শিক্ষায় ছেদ পড়ল। নতুন গুরুর জন্য অনুসন্ধান করতে করতে দিল্লীর বিখ্যাত তবলিয়া খলিফা উস্তাদ নথ্‌থু খাঁয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নথ্‌থু খাঁয়ের কাছে তিনি একাদিক্রমে দশ বৎসর তবলা শিক্ষা করেন।

দীর্ঘকাল শিক্ষা-অন্তে নানা সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই গুণী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন এবং সর্বভারতীয় বিখ্যাত তবলীয়াদের মধ্যে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন করে নেন। তিনি আকাশবাণীতে যোগদান করে তার অনবদ্য একক বাদনে সকলকে চমৎকৃত করেছেন।

বাদন-শৈলী : উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ প্রধানতঃ অজরাড়া ঘরাণার ধারক এবং বাহক হলেও নথ্‌থু খাঁয়ের প্রভাবে দিল্লী-ঘরাণার বাজেও দক্ষতা অর্জন করেন। তাই তার বাদন শৈলীতে অজরাড়া এবং দিল্লীর মিশ্রিত রূপ দেখা যায় এবং এই কারণে তার গৎ, পেশকার, কায়দা ইত্যাদি সকল কিছুতেই একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। একক বাদনে কিংবা লড়ন্ত সংগতে তিনি তার

অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেছেন।

অহমেদজান থিরকুয়া

১৮৯২ সালে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ নামক স্থানে অহমেদজান থিরকুয়া জন্মগ্রহণ করেন। অহমেদজান যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বহু পূর্ব থেকেই তাদের সাংগীতিক ঐতিহ্য ছিল। তার পিতা উস্তাদ হুসেন বক্স খাঁ সারেঙ্গী-বাদক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

অতি অল্প বয়সে পিতার কাছে সারেঙ্গী বাদনে তার প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু সারেঙ্গী বাদন অপেক্ষা তবলার প্রতিই যেন অহমেদজানের পক্ষপাতিত্ব বেশী দেখা যেতে লাগল। অবশ্য এর কারণও ছিল। তবলা বাজাবার প্রেরণা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে মাতুলকুল হতে পান। কারণ তার দুই মাতুল উস্তাদ বশ[illegible] খাঁ ও উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বিশিষ্ট তবলা বাদক ছিলেন। অতএব তবলার প্রতি আগ্রহ দেখে তার পিতা তাকে মাতুলদের কাছে তবলা শিক্ষা করবার জন্য দিলেন। কিছুকাল মাতুলদের কাছে তবলা শিক্ষা অন্তে তিনি মিরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক মুনীর খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে দীর্ঘ ২৪।২৫ বছর তালিম নেন।

সুদীর্ঘ কালের সাধনায় তবলাবাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে তিনি নানা সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হলেন। তার গুণমুগ্ধ রামপুরের নবাব তাকে নিজ দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে তিনি প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে (তৎকালীন লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ) তবলার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান ক[illegible] আট বৎসর কাল অধ্যাপনা করে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ ক[illegible]

অহমেদজান তার সুযোগ্য শি[illegible] [illegible] শিল্পী তৈরী করেছেন। তার তিন পুত্র ইতিমধ্যে [illegible] সুনাম অর্জ্জন করেছেন। নবীজান, আলীজান ও মহম্মদ [illegible] পুত্র ব্যতীত অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বাংলার ছন্নু গাঙ্গুলী, [illegible] [illegible] লায়ল, মেহবুব খাঁ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য

তবলা বাদনে অহমেদজান সাহেবের দক্ষতায় চমৎকৃত হয়ে উস্তাদ আবদুল আজীজ খাঁ সাহেব তাকে ' থিরকুয়া" উপাধি দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি কানপুর সংগীত ভারতী হতে "সংগীত মার্তণ্ড" এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে "আফতাবী মৌসিকী" উপাধি পান। প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাকে "পদ্মভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইনি লক্ষ্ণৌতে দেহরক্ষা করেন।

বাদন শৈলী : উস্তাদ মুনীর খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তালিম নেবার জন্য থিরকুয়া সাহেবের বাদনে দিল্লী ঘরাণার প্রভাবই সর্বাধিক। তাই তার বাদনে চাঁটির প্রয়োগ মাধুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাঁয়া এবং তবলার সম-প্রাধান্য তার বাদন শৈলীকে অধিকতর শ্রুতিমধুর করেছে। তাছাড়া কায়দা, পেশকার ইত্যাদির বিধিসম্মত প্রয়োগ এবং ছোট ছোট মুখড়া, মোহরা বা লয়ের কাজ তার বাদন-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দিল্লী ঘরাণা ব্যতীত ফরুখাবাদ এবং অন্যান্য ঘরাণার বাদন পদ্ধতির সঙ্গে তার বিশেষভাবে পরিচয় ছিল বলে তার বাদন-শৈলী একদিকে যেমন সমৃদ্ধ, অপরদিকে তেমনই বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তর্জনী এবং মধ্যমার বিশেষ প্রয়োগনৈপুণ্যের জন্য তার বাদন মিষ্টত্বে অতুলনীয়।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৬ সাল। স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হল। রাত্রি ১টা মহাসমারোহে চলেছে All Bengal Music Conference। নামে All Bengal হলেও এখানে সর্বভারতীয় প্রখ্যাত শিল্পী সমাবেশ ঘটেছে। উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব সবেমাত্র তার অনুষ্ঠান শেষ করেছেন। উস্তাদজীর কিন্নর কণ্ঠের সুরের যাদুতে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী সম্মোহিত। সকলেরই মনে হচ্ছে যে এর পর আর কিছু শুনবার বা শোনাবার থাকতে পারে না এবং সেই চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ; কারণ সুরের এই অনাস্বাদিত পরিমণ্ডল ভেদ করে তা' শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না। এমন সময় ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেল যে এবার আসরে আসছেন সেতারের যাদুকর এনায়েৎ খাঁ সাহেব এবং তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মুহূর্তে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মাইক অসহযোগিতা সুরু করল। এই পরিবেশে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির সাফল্য সম্বন্ধে সকলেরই মনে আশঙ্কা। যাই হোক খাঁ সাহেব সেতারে ঝঙ্কার তুললেন, প্রস্তুত হয়ে বসলেন চিন্তান্বিত কেশব বাবু। কেশব বাবুর বাজনা কিছুটা অগ্রসর হতেই শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল সকলেই উৎকর্ণ হয়ে দুই প্রধানের বাজনা শুনতে লাগলেন। একদিকে আত্মসমাহিত সাধক খাঁ সাহেব, অপরদিকে বহু অভিজ্ঞ তবলার যাদুকর কেশব বাবু। মাইকের সাহায্য ব্যতীতই প্রায় দুই ঘণ্টা বাজাবার পর যখন খাঁ সাহেব তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতৃমণ্ডলী দুই শিল্পীকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করলেন। এরপর থেকেই একজন উচ্চকোটির তবলা বাদক হিসাবে কেশববাবুর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন মুড়াপাড়া গ্রামে ৬ই জানুয়ারী, বুধবার ১৮৯২ সালে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কেশব বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা শহরে ৺পূর্ণচন্দ্রের নিজস্ব বাটী ছিল এবং তিনি একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন।

এই পরিবারে সংগীতকে আবাহন করেন কেশব বাবুর বাবুর পিতামহ ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন তবলা বাদক ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন দক্ষ হারমোনিয়াম-বাদক ছিলেন। পিতৃবন্ধু ব্রাহ্মসমাজের চন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে মাঝে মাঝে গৃহে সংগীতের আসরও বসত। তাই দেখা যায় শৈশবকাল হতেই পিতার একমাত্র সন্তান কেশব বাবু একটি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েছেন। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সংগীতের স্ফুরণ দেখা যায় এবং এই সময় শিশু কেশবচন্দ্রের খোল বাজাবার প্রচেষ্টায় আত্মীয়স্বজন সকলেই অবাক হয়ে যেতেন। পাঁচ বছর থেকেই তিনি রীতিমত কীর্তনের সঙ্গে সংগত করেন। এরপর ৮।৯ বছর বয়সে বিখ্যাত ভগবান দাস সেতারীর ভাগিনেয় যদুনাথ দাসের কাছে সেতারে তাঁর হাতেখড়ি হয়। যদুনাথ দাসের পর স্বয়ং ভগবান দাস সেতারীর কাছে তিনি ৪।৫ বছর সেতারে তালিম নেন।

কিন্তু সেতার বেশীদিন তাকে আকর্ষণ করে রাখতে পারল না। তাই ১২ বছর বয়সেই তিনি আগ্রা ঘরাণার প্রতিনিধিস্থানীয় তবলিয়া উস্তাদ আতা-হোসেন খাঁয়ের শিষ্য ৺প্রসন্নবণিকের কাছে তবলায় তালিম নেওয়া সুরু করেন এবং প্রায়-১২ বছর তাঁর শিক্ষাধীনে থাকেন। পরে তিনি অনোখেলালের গুরুভাই বেনারসের মৌলবীরাম মিশ্রের কাছে চার বছর তবলা শিক্ষা করেন। সর্বশেষে দিল্লী ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি উস্তাদ নাথ্‌ খাঁয়ের কাছে তিনি প্রায় আড়াই বছর তালিম নেন এবং উস্তাদজী এই সময় ঢাকায় তাদের বাড়ীতেই কিছুকাল অবস্থান করেন।

সংগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায় তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত তার বিদ্যাচর্চা অব্যাহতভাবে চলেছিল। শিক্ষা ছাড়াও কণ্ঠসংগীতের সামান্য কিছু চর্চা তিনি করেছিলেন, তবে তা নিতান্তই সখের জন্য।

তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একজন শিল্পী ছিলেন এবং একাধিক সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালে All Bengal Music Conference ও ১৯৪৪ সালে All India Music Conference উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫-৩৭ সালে পর্যন্ত তিনি Allahabad Music Conference-এ জজিয়তি করেন। তাছাড়া ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত Music Competition-এ জজিয়তি করেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।

খেলাধুলায় এবং সমাজসেবক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তিনি ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের Vice President এবং ১৯৩০ হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা পুর্ব Bengal Legislative Council এর সদস্য ছিলেন।

কেশব বাবু ভারত বিখ্যাত বহু শিল্পীর সঙ্গেই সংগত করেছেন এবং তাদের মধ্যে ডি. ভি. পালুস্কর, শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝঙ্কার, গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জমিরুদ্দিন খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপচাঁদ বেদী, চমন খাঁয়ের পিতা সেখায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, ভি. জি. যোগ,

পান্নালাল ঘোষ, রামকিষণ মিশ্র, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, কে. এল. সায়গল, প্রখ্যাত সেতারী এনায়েৎ খাঁ, রামপুরের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক মুস্তাক হুসেন খাঁ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেশববাবুর প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯৫২ সালে 'ব্রজেন্দ্র কিশোর স্মৃতি সমিতি' তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং ১৯৫৭ সালে সুরেশ সংগীত সংসদ তাকে "Musician of Bengal in Tabla" বলে সম্বর্ধিত করে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

অশীতিপর বয়স্ক এই জ্ঞানবৃদ্ধ সংগীত-সাধক আজও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করে সংগীতের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

বাদন শৈলী : কেশব বাবুর বাদন শৈলীর মধ্যে দিল্লী বাজের প্রভাবই সব থেকে বেশী তবে বিভিন্ন ঘরাণার একাধিক উস্তাদের সংস্পর্শে আসবার জন্য প্রায় প্রত্যেকটি ঘরাণার প্রভাব তার উপর পড়েছে। সেই জন্য পরবর্তীকালে বাদনে তার একটি নিজস্ব রীতি (Style) গড়ে উঠেছে।

উস্তাদ মসিত খাঁ

১৮৯৪ সালে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদে মসিত খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল নন্নে খাঁ। নন্নে খাঁ ফরুখাবাদ ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক ছিলেন। রামপুরের রাজা তাকে নিজের দরবারে সসম্মানে নিযুক্ত করেন এবং তখন হতেই এই পরিবার রামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

মসিত খাঁ পিতার শিক্ষাধীনে থেকে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তবলা বাদনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এলাহাবাদের সংগীত সম্মেলনে তরুণ তবলা বাদক মসিত খাঁ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক ফুলঝুরি সেই সম্মেলনে তার বাজনা পরিবেশন করবার পর যখন অন্য কোনও তবলা-বাদক আসরে বসতে সাহস পেলেন না, তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এলেন আত্মনির্ভর তরুণ সাধক উস্তাদ মসিত খাঁ। বিস্মিত

সন্দিগ্ধ শ্রোতারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তার বাজনা শুনতে লাগলেন এবং অনুষ্ঠান-অন্তে সমবেত সাধুবাদে মুখর হলেন।

উস্তাদ মসিত খাঁ। রামপুর হতে কোলকাতায় এসে বসবাস সুরু করেন। তার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল, মুন্নে খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তার সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ সর্বভারতে একজন প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বাদন-শৈলী: উস্তাদী অপেক্ষা বাজনায় তিনি মিষ্টত্বের পক্ষপাতি ছিলেন। তাই ফরুখাবাদ ঘরাণা তার হাতে এক নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তার অননুকরণীয় প্রয়োগ-পদ্ধতি তথা হস্ত-কৌশলে কায়দা, পেশকার, রেলা কিংবা লয়-বৈচিত্র্যের সহজ সরল রূপায়ণ এবং গতি-মাধুর্য তবলা বাদনে এনেছিল এক নতুন বৈশিষ্ট্য।

হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী

হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী ১৯১১ সালে কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নাম ছিল মন্মথনাথ গাঙ্গুলী। ভবানীপুর অঞ্চলে এই গাঙ্গুলী পরিবার ছিল শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান। হীরুবাবুর পিতা মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কোলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তার জ্যেষ্ঠ তাত (মন্মথবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সুরথনাথ গাঙ্গুলী হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং মাতামহ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই পরিবারটির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যও উল্লেখনীয়। হীরুবাবুর পিতা একজন উত্তম তবলা-বাদক ছিলেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত তবলা বাদক বাবু খাঁয়ের কাছে তালিম নেন। মাতামহ রজনীকান্ত সংগীতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী। তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক তথা কর্ণধার ছিলেন। তিনি নিজের দুই পুত্র কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু) ও শ্যাম গাঙ্গুলীকে সংগীত চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেন এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রথমজন তবলায়

এবং দ্বিতীয়জন সরোদ বাজনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এই পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই হীরুবাবুর মধ্যে শৈশব হতেই সংগীতপ্রীতি জাগ্রত হয় এবং পিতার উৎসাহে তবলা বাজনায় প্রথম হাতেখড়ি তার কাছেই হয়। তার পিতা কেবলমাত্র নিজপুত্রকেই নয়, সংগীতের প্রসারার্থে বিনা পারিশ্রমিকে বহু ব্যক্তিকেই তবলা শিক্ষা দিতেন। তখনকার দিনে অপাংক্তেয় সংগীতকে এইভাবে অকুতোভয়ে জনসমাজে প্রচার করা নিঃসন্দেহে গাঙ্গুলী পরিবারের এক বৈপ্লবিক কীর্তি বলে অভিহিত করা যায়।

হীরুবাবু নিজের সহজাত প্রতিভা এবং আন্তরিক প্রযত্নের দ্বারা তবলা-বাদনে সম্যক অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখলেন। কিছুকাল পিতার কাছে শিক্ষার পর তিনি পিতার গুরুভাই নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছে পাঁচ বৎসরকাল তালিম নেন এবং সর্বশেষে একাদিক্রমে ১২।১৩ বৎসর লক্ষ্ণৌয়ের ভারত-বিখ্যাত তবলা-বাদক খলিফা আবিদ হোসেনের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছিল এবং তিনি একে একে ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ., বি. এ., বি. এল. এবং এটর্নিশিপ পরীক্ষাদিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

তার কর্মজীবন ও শিল্পীজীবন সমান্তরালভাবে পাশাপাশি চলল। তবলা-বাদনে ধীরে ধীরে তিনি সারা ভারতে সুনাম অর্জন করেন এবং অজস্র সংগীত সম্মেলনে তার অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৫০ সালে কোলকাতার অন্যতম সম্ভ্রান্ত সংগীতচক্র "ঝঙ্কার" তার প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সম্মানসূচক "ডক্টর অফ মিউজিক" উপাধিতে ভূষিত করে এবং ১৯৫২ সালে কলিকাতা পৌর সংস্থা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাকে পৌর সম্বর্দ্ধনা জানায়।

বর্তমানে এই নিরহঙ্কার, অমায়িক শিল্পী মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংগীতের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ছাত্রকে বিদ্যাদানে কার্পণ্য করেন না।

বাদন-শৈলী : হীরুবাবুর বাদন-শৈলীতে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রাধান্যই সর্বাধিক। তার বিজ্ঞানসম্মত হস্ত চালনায় বোল, কায়দা, পেশকার, লয়-

কারীর কাজ প্রভৃতির মধ্যে একটি অনায়াস মাধুর্যের প্রকাশ দেখা যায়। পাঞ্জাব রাজের মত তার পরিবেশিত বন্দিশে খোলা এবং জোরদার আওয়াজের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে Jack of all trades, Master of none। কিন্তু সব কিছুরই যেমন ব্যতিক্রম আছে, এই প্রবাদটিরও ব্যতিক্রম আছে এবং বর্তমান সংগীতাকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তার সুস্পষ্ট উদাহরণ। তবলা-বাদন ব্যতীত যা কিছুতেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন, সে ক্রীড়াতেই হোক বা চিত্রাঙ্কন হোক, সাফল্যের চাবিকাঠি তিনি করতলগত করেছেন। কেবলমাত্র বিধির নির্বন্ধে তাকে নানা পথ পরিক্রমান্তে সংগীতকেই বেছে নিতে হয়েছে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে এবং মনে হয় সংগীত-জগতের সমৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

শুভ ২৫শে বৈশাখ। ১৩১৬ সালের এই দিনটিতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতসাধক জ্ঞানপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করেন। ২৫শে বৈশাখ দিনটি আর একটি কারণে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে; কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ১৮৬১ সালের এই দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানবাবুর পিতার নাম কিরণচন্দ্র ঘোষ এবং পিতামহের নাম ছিল দ্বারকানাথ ঘোষ। দ্বারকানাথ ঘোষই বর্তমানের সুপরিচিত ডোয়ার্কিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্রান্ত পরিবারে সাংগীতিক পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানবাবুর শৈশব অতিবাহিত হয়। তার পিতা একজন বিদগ্ধ সংগীত-রসিক ছিলেন, পিতামহ ছিলেন দক্ষ বেহালাবাদক এবং খুল্লতাত শরৎ ঘোষ উচ্চ-স্তরের পিয়ানো-বাদক ছিলেন।

পরিবেশের গুণে সুরের প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে সুরের নেশা তার লক্ষ্য থেকে অর্থাৎ শিক্ষাজীবন থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এক টিরপর একটি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্নাতকোত্তর পাঠ তাকে অসমাপ্ত রাখতে হল। শিক্ষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কন এবং ক্রিকেট খেলাতেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং এই সময়েই চিত্রশিল্পী

হবার একটা গোপন বাসনা তার মনে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধিনির্দিষ্ট পথেই অর্থাৎ চিত্রশিল্পীর পরিবর্তে সংগীত শিল্পী হিসাবে তাকে পদচারণা আরম্ভ করতে হল।

মাত্র সাত বছর বয়সেই টনিবাবুর শিক্ষাধীনে তবলা বাদনে তার প্রথম হাতেখড়ি হয়। তারপর একে একে শিক্ষাগুরু হিসাবে তিনি পেয়েছেন আজিম খাঁ, মজিদ খাঁ এবং ফিরোজ খাঁ সাহেবকে। বিশেষ করে মজিদ খাঁ সাহেব তার অসাধারণ প্রতিভা দেখে প্রিয়তম শিষ্যকে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন।

যার মধ্যে নিরন্তর অনির্বাণ জ্ঞানস্পৃহা রয়েছে কেবলমাত্র তবলা বাদনে তার তৃপ্তি আসা সম্ভব নয়। তাই এই অতৃপ্ত শিল্পী সংগীতের নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ তথা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হলেন। তবলা ব্যতীত তিনি অনবদ্ধ বাদ্য খোলের তালিম নেন পণ্ডিত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে এবং পাখোয়াজের তালিম নেন বিপিন বাবুর কাছে।

তার সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হল গান শেখা। সংগীতের একটি শাখায় দক্ষতা অর্জন করলে বিশেষ করে ছন্দ তথা তালে, অন্যান্য শাখায় সাফল্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এবং তার সঙ্গে প্রতিভার স্পর্শ থাকলে তো কথাই নেই। তাই জ্ঞান বাবুও অচিরেই এই শাখায় তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হলেন। তার সংগীত-গুরু ছিলেন রামপুরের বিখ্যাত উস্তাদ শব্বন খাঁ এবং সগীর খাঁ। উস্তাদ খুশি মহম্মদের কাছে তিনি নেন হারমোনিয়াম বাজনার তালিম। ক্রমে ক্রমে তার শিক্ষা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় গীটার এবং বেহালা।

শিক্ষাঅন্তে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পী এইবার নিজেকে নিয়োজিত করলেন সৃষ্টিকার্যে। রেকর্ড-সংগীতে গীটারযন্ত্রের প্রয়োগের পরিকল্পনার তিনিই উদ্ভাবক এবং তিনি নিজে শচীনদেব বর্মন, উমা বসু প্রভৃতি একাধিক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে গীটারে সহযোগিতা করে এর সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। কোলকাতা আকাশবাণীর সংগীত বিভাগ তার দীর্ঘকালের সক্রিয় সহযোগিতায় উন্নত হতে উন্নততর হয়েছে। লঘু সংগীতে প্রযোজক হিসাবে জ্ঞানবাবুর সুযোগ্য পরিচালনা এবং পরামর্শে আকাশবাণীর সংগীতানুষ্ঠানগুলির

একদিকে যেমন মান উন্নত হয়েছে, অপরদিকে তেমনই সেগুলিতে তিনি আমদানী করেছিলেন বৈচিত্র্যের। এই আকাশবাণীতে সর্বপ্রথম 'বাণীসংঘ' কর্তৃক যে ঐকতান বাদন অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞানবাবু বেহালা-বাদক হিসাবে সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।) আকাশবাণী ব্যতীত তিনি ভারতের বহু সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিভার গুণে সর্বভারতীয় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৪ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাশিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি আকাশবাণীর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে পেনসিল্-ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতীয় সংগীতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। আকাশবাণী এবং সংগীত সম্মেলনাদি ব্যতীত চলচ্চিত্রের সংগীতেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বসন্তবাহার, যদুভট্ট প্রভতি তার সার্থক উদাহরণ।

শিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন। দীর্ঘকালের সংগীত জীবনে তিনি অজস্র ছাত্র-ছাত্রী তৈরী করেছেন এবং তাদের সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমানে এই অক্লান্ত সাধক জ্ঞান বিতরণে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। এক কথায় বলতে গেলে তবলা-বাদক হিসাবে জ্ঞানবাবুর অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠা তার বহুমুখী সংগীত প্রতিভায় প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং হয়েছে সার্থক উত্তরণের দিশারী।

বাদন শৈলী : জ্ঞানবাবুর বাদন-শৈলী সম্পূর্ণভাবে ফরুখাবাদ ঘরাণার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সে সত্বেও বিভিন্ন উস্তাদের কাছে তালিম নেবার জন্য এবং নিজের সহজাত প্রতিভার গুণে প্রায় প্রত্যেকটি ঘরাণার বাজ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। তাই তার বাদনে নূতনত্বের সঙ্গে ফরুখাবাদের মিষ্টত্বের সংমিশ্রণ এক অনন্যতা এনে দিয়েছে। গাৎ, কায়দা এবং বাঁয়ার কাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগকলায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

কেরামত খাঁ

১৯১৭ সালে ৫ই মে কেরামত খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম উস্তাদ মসিত খাঁ।

খাঁ সাহেব ৮ বৎসর থেকে রামপুরে নিজের পিতার কাছেই তালিম নেন। ১৯২৭ সালে তিনি পিতার সঙ্গে রামপুর ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অধ্যাবসায়ের জন্য অতি অল্প বয়সেই তবলা-বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে অর্থাৎ মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

যে কোনও সংগীত সম্মেলনে খাঁ সাহেবের উপস্থিতি শ্রোতাদের বিশেষ ভাবে উদ্দীপিত করত এমনই ছিল তার জনপ্রিয়তা। সংগীত-প্রেমীরা তাকে "তবলার যাদুকর" নামে অভিহিত করতেন। কেবল শ্রোতৃবৃন্দ নয়, তার হাতের সুমধুর সংগতে শিল্পীও বিশেষভাবে অনু-প্রাণিত হতেন। খাঁ সাহেবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, যে কোনও শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতায় অর্থাৎ সংগতের অপূর্ব মেজাজে। তিনি কোন সময়েই নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে শিল্পীর রসভঙ্গ বা মেজাজ নষ্ট করতেন না। একক বাদনেও খাঁ সাহেবকে এক কথায় অনন্য বলা চলে।

কোলকাতার আকাশবাণীর সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারী হয়েছেন। তাছাড়া ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কাবুল, পাকিস্তান এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৭ সালে সংগীত নাটক একাডেমী তাকে পুরস্কৃত করেন।

তার সুযোগ্য শিক্ষাদানে অনেকেই ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন এবং তাদের মধ্যে নিখিল ঘোষ, অনিল রায়চৌধুরী, ফকির মহম্মদ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে এই জনপ্রিয় শিল্পী দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি মাত্র পুত্র এবং পঞ্চকন্যা রেখে গেছেন।

বাদন শৈলী: পিতার সকল কিছুর উত্তরাধিকারী হিসাবে খাঁ সাহেবের মধ্যেও ফরুখাবাদ ঘরাণার সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়। তার বোলগুলি স্পষ্ট; সুমিষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। নিজ ঘরাণার সঙ্গে অন্যান্য

ঘরাণার কিছু মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি তার বাদন-শৈলীতে নূতনত্বের আমদানী করেছেন। এক কথায়, খাঁ সাহেবকে বলা যায় ফরুখাবাদ ঘরাণার সার্থক উত্তরাধিকারী।

উস্তাদ আল্লারাখা

১৯১৫ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জিলার রতনগড় গ্রামে এক কৃষক পরিবারে আল্লারাখার জন্ম হয়। সাধারণ কৃষক পরিবারের মত তার পিতাও চেয়েছিলেন যে আল্লারাখা কৃষিকাজেই পিতার সহযোগিতা করবেন। কিন্তু সংগীতের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থাকায় তিনি পিতার মতানুবর্তী না হয়ে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে পাঠানকোটে একটি নাটক কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উস্তাদ কাদির বক্সের শিষ্য উস্তাদ লাল মহম্মদের কাছে তবলা এবং কণ্ঠসংগীত চর্চা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে চাকুরী পরিত্যাগ করে নিজ জন্মস্থান গুরুদাসপুরে এসে তিনি একটি সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানটি তিনি চালাতে পারলেন না। সংগীত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে তিনি তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে লাহোর চলে যান এবং উস্তাদ কাদের বখ্‌শের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১২/১৩ বছর কাদের বখ্‌শের কাছে শিক্ষালাভ করে একজন সফল তবলা-বাদক হিসাবে আল্লারাখা আত্মপ্রকাশ করেন। রেকর্ড কোম্পানী এবং আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। পরে তিনি বোম্বে চলে যান এবং এ. আর. কুরেশী নাম নিয়ে ছায়াচিত্র জগতে সংগীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বহুবার বিদেশে ভ্রমণ করেছেন এবং অশেষ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ভারতের আল্লারাখা আজ বিদেশের সংগীত-রসিক মহলে একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৬০ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

কেবলমাত্র তবলা-বাদনে নয়, কণ্ঠসংগীতেও তার দক্ষতা আছে। তার কণ্ঠ সুরেলা এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবী ঠুংরীতে তিনি পারদর্শী।

অবিস্মরণীয় নাম। ১৯২১ সালে ২০শে জুলাই সামতাপ্রসাদ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বাচা মিশ্র, পিতামহের নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রপিতামহ ছিলেন প্রতাপ মহারাজ। সামতাপ্রসাদের আর একটি নাম ছিল "গদাই মহারাজ"।

বারাণসীর মিশ্র পরিবার তবলা বাদনে একদিকে যেমন ছিলেন বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী, অপরদিকে ছিলেন তেমনই একাধিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার জন্মদাতা। পিতাই ছিলেন সামতাপ্রসাদের সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র সাত বৎসর বয়সে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তার শিক্ষার পথ সাময়িকভাবে ব্যাহত হল, কিন্তু রুদ্ধ হল না। তিনি বলদেব সহায়ের শিষ্য পণ্ডিত বিক্কু মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং নতুন উদ্যমে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। শোনা যায় যে, তিনি দিনের পর দিন ১৬।১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত রিয়াজ করেছেন। জন্মগত প্রতিভার সঙ্গে একনিষ্ঠ সাধনা অচিরেই সিদ্ধিকে তার করতলগত করল।

১৯৪২ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন ২১ বৎসরের যুবক সামতাপ্রসাদ। ভারতবিখ্যাত গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে সেই সম্মেলনে। এই ধরণের বৃহৎ সম্মেলনে সামতাপ্রসাদের প্রথম অংশ গ্রহণ, তাই তার মনে নানা আশঙ্কার কাল মেঘ কিন্তু সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং গুরুর আশীর্বাদে তিনি সসম্মানে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং এই সম্মেলনেই প্রথম শ্রেণীর তবলা-বাদক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এরপর সুরু হল তার একের পর এক জয়যাত্রা—দেশে এবং বিদেশে। কোলকাতা, বোম্বাই, গোয়ালিয়র, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি অল্পকালের মধ্যেই সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ তবলা বাদকদের মধ্যে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিলেন। হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবির সংগীতাংশে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। যে সকল ছায়াছবিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে', 'বসন্ত বাহার', '[illegible]', 'টুনী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিদেশেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা উড্ডীন করে তার গৌরব

বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকার তাকে বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে লণ্ডনে এডিনবরার সাংগীতিক উৎসবে সামতাপ্রসাদের তবলা-বাদন সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে।

তবলার যাদুকর পণ্ডিত সামতাপ্রসাদ নিজের দুই পুত্র কুমারলাল ও কৈলাসকে তবলা শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত ইতিমধ্যেই উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী তৈরী করেছেন যাদের মধ্যে নবকুমার পাণ্ডা, সত্যনারায়ণ বশিষ্ঠ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র তবলা-বাদনে নয়, সংগীতেও তার দক্ষতা আছে এবং ঠুংরী গান তার বিশেষ প্রিয়। গীত ও বাদ্য ব্যতীত নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতেও তিনি সমভাবে পারদর্শী।

বর্তমানেও যে কোনও সংগীতের আসরে পণ্ডিত সামতাপ্রসাদের উপস্থিতি গুণীজন মহলে বিশেষ উৎসাহ জাগ্রত করে এবং তিনিও তার স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস দক্ষতার দ্বারা শিল্পী এবং শ্রোতৃবৃন্দকে সমভাবে তৃপ্ত করেন। সদানন্দময় এই শিল্পী দীর্ঘজীবন লাভ করে সংগীত-জগৎকে আরও সমৃদ্ধ করুন - আজ সকলেরই এই কামনা।

বাদন শৈলী: পণ্ডিত সামতাপ্রসাদের বাদন-শৈলীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) তিনি বেনারস ঘরাণার সার্থক উত্তরসাধক।

(২) স্পষ্ট এবং জোরদার আওয়াজ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৩) হস্তকৌশলে বাদন মাধুর্য অধিকতর পরিস্ফুট।

(৪) জড়তাবিহীন স্বচ্ছন্দ গতি মনমুগ্ধকর।

(৫) কায়দা, পেশকার, লগ্গী এবং বিশেষ করে ছন্দের কাজে তার দক্ষতা অপরিসীম।

(৬) বিভিন্ন বাজের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বাদন-শৈলীতে নূতনত্বের আমদানী।

লালজী শ্রীবাস্তব

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৪ সালে এলাহাবাদের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে লালজী শ্রীবাস্তবের জন্ম হয়। তার পোষাকী নাম ছিল উদয়ভান কিশোর, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার ডাক নাম 'লালজী' নামেই পরিচিত হন। লালজীর পিতা রাজকিশোর উত্তরপ্রদেশ সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সেই লালজীর পিতৃবিয়োগ হয় এবং মাতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে লালজীর শৈশব এবং কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়।

বাল্যকাল হতেই লালজীর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়, কিন্তু পরিবারে সংগীত চর্চার কোন ঐতিহ্য না থাকায় এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা কিংবা উৎসাহ পাননি। যাই হোক ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল এবং তিনি ছতরপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ ইউসুফ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লালজীর ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে খাঁ সাহেব তাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে তালিম দেন। 'চার বৎসর কাল লালজী খাঁসাহেবের কাছে শিক্ষাধীন ছিলেন। এদিকে সাধারণ শিক্ষা পর্যায়েও তার ছেদ পড়েনি। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করবার পর পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি সংগীত সাধনায় সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলেন। তার এই সিদ্ধান্তে পরিবারের সম্মতি না থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা লালজীর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। যাই হোক এইভাবে গুরুর সাহায্য ছাড়াই ২।৩ বছর গৃহেতেই তিনি রিয়াজ করেন। এই সময় বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক পণ্ডিত শ্যামলাল এলাহাহাদ এসে কয়েক বছর বসবাস করেন। লালজী কালবিলম্ব না করে পণ্ডিত শ্যামলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় তিন বৎসর তার কাছে তালিম নেন। কিন্তু তিন বছর পর শ্যামলালজী বারাণসী প্রত্যাবর্তন করলে আবার তিনি সমস্যায় পড়লেন এবং নতুন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। তার সৌভাগ্যবশতঃ জয়পুরের বিখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত জয়লাল সেই সময় (১৯৪৭) এলাহাবাদ এলেন এবং লালজী পণ্ডিত জয়লালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রায় দুই বৎসর তার শিক্ষাধীনে থাকেন। দুই বৎসর পর পণ্ডিত জয়লাল এলাহাবাদ পরিত্যাগ করলে লালজী আর গুরুর সন্ধান না করে ইতিমধ্যে তার

অধিগত বিদ্যাকে ত্রুটিহীন করবার জন্ত কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

লালজী এইবার নানা সংগীত অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তবলাদক হিসাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৫৭ সালে কানপুরের ললিতকলা বিদ্যাপীঠের দ্বারা তিনি "আচার্য" পদবীতে ভূষিত হন। এলাহাবাদ প্রয়াগ সংগীত সমিতিতে দীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। তার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর নাম—বুলাকীলাল যাদব, প্রভুদত্ত বাজপেয়ী, গিরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তব ইত্যাদি।

বাদন শৈলী : বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে শিক্ষা করবার জন্ত লালজীর পরিচয় হয়েছিল বিভিন্ন বাজ তথা ঘরানার সঙ্গে এবং সেইজন্ত তার বাদন শৈলীও নূতনভাবে পরিশীলিত হয়েছিল। পূরব ও পশ্চিম বাজের সংমিশ্রণে তার বাদন-শৈলীতে এসেছে এক অভিনবত্ব এবং এই বাদন-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, একে সমভাবে গীতে ও নৃত্যে প্রয়োগ করা চলে, অর্থাৎ এই বাদন-শৈলী গীত এবং নৃত্য উভয়েরই উপযোগী। তার বাদনে পেশকার, রেলা, কায়দা বিস্তার ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তাছাড়া একই মাত্রা-সংখ্যায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগেও তিনি পারদর্শী। সর্বশেষে তার বাদন, শৈলীর উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দ্রুত এবং অতি দ্রুতলয়ে সঠিক অঙ্গুলীচালনার মাধ্যমে বোলের স্পষ্ট রূপায়ণ।

পণ্ডিত কিষণ মহারাজ

বর্তমানকালে সর্বভারতে প্রথম সারীর প্রতিভাবান মুষ্টিমেয় তবলা-বাদকদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত কিষণ মহারাজ সংগীত-জগতের দিক্‌পাল পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের দত্তক পুত্র। পঃ কণ্ঠে মহারাজের বাদন-শৈলী তথা পূরব বাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় করবার পিছনে পঃ কিষণ মহারাজের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়া একথা বললেও অত্যুক্তি

হবে না যে লয়কারীর কাজে এই প্রথিতযশা শিল্পী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে, তবলা-বাদক হিসাবে তিনি নিজেকে পঃ কণ্ঠে মহারাজের সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বারাণসীতে পঃ কিষণ মহারাজের জন্ম হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে ভূমিষ্ঠ হবার জন্যই তার নামকরণ করা হয় কিষণ। শৈশবে মাত্র ৬।৭ বৎসর বয়সেই তবলা-বাদনে তার হাতেখড়ি হয়। এর পর সুরু হল পিতার তত্ত্বাবধানে কঠোর সাধনা। কাষ্ঠাচ্ছাদিত যে তবলায় পণ্ডিতজী হস্তসাধন করেছেন, সেই তবলা গ্রন্থকারকে দেখিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবনের কিছু ইংগিত দিয়েছেন। এই শিক্ষাপর্বে তিনি পিতার সঙ্গে একাধিক সংগীতের আসরে গিয়েছেন এবং কখনো কখনো অংশ গ্রহণও করেছেন। কৈশোর বয়স থেকেই তার প্রতিভা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অচিরেই তিনি গুণীমহলে সবিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

অসাধারণ লয়দার শিল্পী প্রথমাবধি আড়ী বা বিষম ছন্দের লয় অভ্যাস করেছেন, তাই পরবর্তীকালে যে কোনও মাত্রার ঠেকা বাজানোতে তিনি হয়েছেন সিদ্ধহস্ত। প্রসঙ্গতঃ নিম্নলিখিত ঘটনাটি হতে বোঝা যাবে যে তিনি কত উচ্চস্তরের শিল্পী।

বারাণসীতে একটি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে সেই সম্মেলনে। বলা বাহুল্য পণ্ডিতজীও যথারীতি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। যথাসময়ে তবলা সহ তিনি মঞ্চে উপবেশন করেছেন জনৈক বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য। নৃত্যশিল্পী প্রারম্ভেই কিষণ মহারাজকে ২১ মাত্রার তাল সঙ্গত করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বলা বাহুল্য যে বিষম মাত্রার অপ্রচলিত তাল বাজাবার এই অনুরোধ প্রকারান্তরে চ্যালেঞ্জেরই সামিল। অবিচলিত কিষণ মহারাজ প্রশান্ত বদনে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, যদিও ২১ মাত্রার কোন তাল বাজাবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। যাই হোক অনুষ্ঠান সুরু হল। নৃত্যছন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলল ঐন্দ্রজালিক শিল্পীর তালের ফুলঝুরি। কে বলবে যে শিল্পী এই তাল বাজাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সমগ্র

শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ। অনুষ্ঠান যখন শেষ হল কিষণ মহারাজের অসাধারণ কৃতিত্বে সকলে চমৎকৃত ও বিমোহিত। বিনম্র নিরহঙ্কার শিল্পী সকলের সাধুবাদ নিয়ে মাথা উঁচু করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

সর্বভারতে বহু সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন এবং উত্তরোত্তর যশের শিখরে আরোহন করেছেন। প্রথম শ্রেণীর এমন শিল্পী খুব কমই আছেন যার সঙ্গে তিনি সঙ্গত করেন নি। বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তিনি সম্মানিত হয়েছেন এবং তাকে বাদন-পরঙ্গত, সংগতৃ- সম্রাট, সংগীতরত্ন ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে আফগান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আফগানিস্থানে যান এবং সেখানেও সম্মানিত হন। তাছাড়া রাশিয়া, লণ্ডন, মরিসাস, চেকোশ্লোভা- কিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ভারত সরকারের সাংগীতিক প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সফর করেছেন এবং প্রতিটি স্থানেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

যশের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হয়েও পণ্ডিত কিষণ মহারাজ আজও একদিকে যেমন নতুন সৃষ্টিতে মগ্ন অপরদিকে তেমনই উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী গঠনেও যত্নবান। এই প্রতিভাবান শিল্পীর দ্বারা সংগীত জগৎ নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হতে সমৃদ্ধতর হবে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগেকার কথা। অধুনা বাঙলা দেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম থেকে একটি বর্ধিষ্ণু বাঙালী পরিবার চলে এলেন সুদূর বারাণসীতে। এই পরিবারের কর্ণধার ৺কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্ন ভিষগাচার্য ছিলেন একজন উচ্চস্তরের আয়ুর্বেদজ্ঞ। অল্পদিনের মধ্যেই তার চিকিৎসার খ্যাতি সুদূর কাশ্মীর থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং তাঁর জীবনে অর্থ সম্মান এসেছিল অপর্যাপ্ত। ৺কবিরাজ উমাচরণ ভট্টাচার্যের দুই পুত্রের মধ্যে বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বিশ্বেশ্বর প্রসাদ একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন অপরদিকে তেমনই পিতার পেশায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি হয়েছিলেন ষড়দর্শনাচার্য,

সাংখ্যতীর্থ এবং শাস্ত্রী। তার গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল।

বিশ্বেশ্বর প্রসাদের তিন পুত্রের মধ্যে আশুতোষ ভট্টাচার্য হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ। ১৯১৭ সালের ১০ই মার্চ বারাণসীতে তার জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে সংগীতের স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। পিতা সংগীতজ্ঞ না হলেও সংগীতপ্রেমী ছিলেন এবং নিজেও সামান্য তবলা বাজাতেন। তাছাড়া এই পরিবারের সংগীতপ্রিয়তার জন্য তৎকালীন উচ্চস্তরের সংগীত শিল্পীদের নিয়ে বাড়ীতে প্রায়ই জলসা বসত। মাত্র ১০ বছর বয়সেই আশুবাবুর সংগীতে হাতেখড়ি হয় তৎকালীন বিখ্যাত পাখোয়াজী পঃ রামদেও পাঁড়ের কাছে কিন্তু ৩।৪ বছর পরে রামদেওজী এলাহাবাদ চলে যাওয়ায় পাখোয়াজ শিক্ষার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। তবে ইতিমধ্যেই কিশোর আকৃষ্ট হয়েছেন তবলার প্রতি এবং বিক্ষিপ্তভাবে চলছে তার তবলা বাদন। এই সময়েই বারাণসীর দশাশ্বমেধের একটি জলসায় ৺কণ্ঠে মহারাজের প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে অপূর্ব একক তবলা বাদন শুনে তিনি সম্মোহিত হন এবং সেই দিনই উৎসবান্তে কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে আলাপ হল এবং তবলা বাদনে আগ্রহী দেখে পঃ কণ্ঠে মহারাজ তাকে শিষ্য করে নিতে সম্মত হন। কিন্তু এই শিক্ষাপর্বেই অকাল পিতৃবিয়োগে ১৫।১৬ বছরের কিশোর স্বভাবতই কিছুটা মুহ্যমান হয়ে পড়েন যাই হোক শিক্ষারম্ভ থেকে গুরুর দেহ রক্ষার দেড় বছর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩০।৩২ বছর তিনি তার কাছে তালিম নেন।

অবশ্য সংগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষাজীবনও চলতে থাকে এবং ব্যাকরণে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় পাশ করবার পর তিনি দিল্লীর টিব্বিয়া কলেজ থেকে পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম সমাপনান্তে আয়ুর্বেদ শাখায় 'ভিশধাচার্য ধন্বন্তরী' উপাধি নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। দিল্লীতে পাঁচ বছর থাকাকালীন উস্তাদ নথ্থু খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ কাল্লু খাঁর সাহচর্যে দিল্লীবাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সেই এলাহাবাদের সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে আশুবাবুর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে সংগত করে স্বয়ং উস্তাদ এবং শ্রোতবৃন্দের কাছ থেকে অজস্র সাধুবাদ

পান। এরপর তার নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অজস্র সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সংগীত সম্মেলনেও তিনি আমন্ত্রিত হন। "সুরের পিয়াসী" কথাচিত্রেও তবলা-বাদনরত শিল্পী হিসাবে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

যে সকল সর্বভারতীয় শিল্পীর সঙ্গে তিনি সংগত করেছেন তাদের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁ, হাফিজ আলি, পঃ রবিশঙ্কর, উস্তাদ আলি আকবর, পঃ কৃষ্ণরাও, নারায়ণরাও ব্যাস, ভি. ভি. পালুস্কর, বিলায়েৎ খাঁ, উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, ভি. জি. যোগ, দুত্তীরাজ পালুস্কর, বসির খাঁ, গগন চ্যাটার্জী, নিখিল ব্যানার্জী, মুস্তাক আলী খাঁ, ধীরেন চক্রবর্তী, তারাপদ চক্রবর্তী, শচীনদাস মতিলাল, রাধিকামোহন মৈত্র, শ্যাম গাঙ্গুলী ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এলাহাবাদ বেতার কেন্দ্রের সূচনা থেকেই আশুবাবু তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। সিংহল বেতার কেন্দ্র থেকেও তার তবলা-বাদন প্রচারিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, বারাণসী ইত্যাদি স্থানে এই শিল্পীকে সম্মানিত করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি নয়াদিল্লীতে ফাইনাল অডিশন বোর্ডের অন্যতম বিচারক এবং প্রয়াগ সংগীত সমিতি এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতের পরীক্ষকও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আশুবাবুর তিনটি পুত্র দেবাশীষ, দেবপ্রিয় এবং দেবব্রত। জ্যেষ্ঠ সেতার শিক্ষার্থী, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পিতার কাছে তবলায় তালিম নিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।

তার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম হল মহাদেব চক্রবর্তী (কোলকাতা), অভিজিৎ মজুমদার (মোগলসরাই। ইনি ১৯৫২ সালে সর্বভারতীয় তবলা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী এবং সরকারী বৃত্তিলাভ করেছেন), পরিমল ভট্টাচার্য (শ্যামনগর), কৃষ্ণসাধু ঘোষ, (মেদিনীপুর), সুকুমার রায় (মুর্শিদাবাদ), অর্পণা ভট্টাচার্য (শিলং), গোবিন্দ চক্রবর্তী (বেনারস), কৃপাশঙ্কর (বেনারস), বাণী চ্যাটার্জী (গোরখপুর) ইত্যাদি।

বারাণসীতে প্রথম শ্রেণীর আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসাবে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানেও তিনি একনিষ্ঠ ভাবে ছাত্রদের তবলা শিক্ষা দিচ্ছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে সংগীত শিক্ষা বা পরিবেশনে আশুবাবু কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ এই বৃত্তিতে তিনি আজও অপেশাদার।

প্রসন্নকুমার বণিক

পুরা নাম প্রসন্নকুমার সাহা বণিক। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন বাঙালী শিল্পী সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন, তাদের মধ্যে ৺প্রসন্নকুমার বণিক অন্যতম। ১৮৫৭ সালে ফাল্গুন মাসে ঢাকায় তার জন্ম হয়। পিতার নাম মদনমোহন বণিক। শৈশব থেকেই পুত্রের সংগীতপ্রীতি দেখে পিতা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা না করে আরও উৎসাহ দেবার জন্য ঢাকার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ তবলা ও মৃদঙ্গবাদক গৌরমোহন বসাকের কাছে নিয়ে গেলেন। এখান থেকেই প্রসন্নকুমারের সংগীত জীবনের যাত্রারম্ভ এবং এই সময় তার বয়স মাত্র নয় বৎসর। সুদীর্ঘ নয় বৎসর গৌরমোহনবাবুর কাছে তালিম নিয়ে অতৃপ্ত প্রসন্নকুমার আরও শিক্ষার জন্য গুরুর সম্মতিক্রমে মুর্শিদাবাদের নবাব অমীর উল-ওমরাহের সভাবাদক আতাহোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রতিভাবান শিষ্যটিকে পেয়ে আতা হোসেন খাঁও যত্নসহকারে তাকে একজন পরিণত শিল্পী হিসাবে গড়ে তুললেন।

শিক্ষা অন্তে সুরু হল তার কর্মজীবন। শীঘ্রই তার সুনাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠ কিম্বা যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় তিনি ছিলেন সমানভাবে পারদর্শী। শুধু তাই নয়, তার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল গীত বা বাদ্যের প্রকৃতি-অনুসারী সংগত যা সংগীতে মাধুর্য আনয়ন করে একদিকে যেমন শিল্পীকে করত উৎসাহিত অপরদিকে তেমনই শ্রোতৃবর্গকে করত পুলকিত। এর সর্বপ্রথম কারণ ছিল তার পরিমিতিবোধ এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল পাখোয়াজ বাদনে নৈপুণ্য। ১৩৩৪ সালে ভারত সংগীত-সমাজ নামক তৎকালীন প্রখ্যাত সংগীত-প্রতিষ্ঠানে তাকে অধ্যাপক নিযুক্ত

করা হয়। স্বয়ং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাছাড়া বহুস্থান হতে তিনি নানাভাবে সম্মানিত হন।

তার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রাণবল্লভ গোস্বামী, অক্ষয় কর্মকার ইত্যাদি।

তিনি 'তবলা-তরঙ্গিনী' ও 'মৃদঙ্গ প্রবেশিকা' নামে দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

প্রবন্ধ

সংগীতে লয় তথা তাল মাহাত্ম্য

সংগীতে লয় বা তাল অবিচ্ছেদ্য অংশ। লয় তথা তালের মাহাত্ম্য আলোচনা করবার পূর্বে লয় এবং তালের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন! সংগীতে নিয়মাবদ্ধ ছন্দকেই আমরা 'তাল' বলতে পারি। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময় বিভাগানুযায়ী সাংগীতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হলে তাকে তালবদ্ধ সংগীত বলা হয়। আবার এই তালের মধ্যে কাল ও ক্রিয়ায় সাম্যতা ঘটলে তাকে বলা হয় লয়। "তালঃ কালক্রিয়ামানং লয়ঃ সাম্য যথাস্থিয়াং"। প্রচলিত অর্থে সংগীতে গতিকেই 'লয়' আখ্যা দেওয়া হয় এবং সংগীতের প্রকৃতি অনুযায়ী এই লয়েরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত—লয়ের এই তিন প্রকার গতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র সংগীতে নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি নির্দিষ্ট লয়ে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি সবই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী একই নিয়মে ২৪ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যোদয় তথা সূর্যাস্ত বা দিবা রাত্রির সংঘটন নিয়ম-বহির্ভূত কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি, শারীরিক ক্রিয়া, প্রক্রিয়াদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলেছে। এই চলার ব্যাপারে তখনই বিপর্যয় দেখা দেয় যখন তালভঙ্গ হয়। তালমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'রাগ কল্পদ্রুম'কার বলেছেন—

"উৎপত্যাদি ত্রয়ং লোকে যত্তালেন জায়তে।
কীটকাদি পশুনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ॥
যানি কানি চ কর্মানি লোকে তালাশ্রিতানি চ।
আদিত্যাদি গ্রহানাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, ত্রিজগতের সবকিছুর উৎপত্তি তালের বা লয়ের দ্বারা হওয়ার জন্য কীটাদি ও পশুসমূহের গতিও নির্দিষ্ট তালের দ্বারাই পরিচালিত হয়। জগতের সবকিছু ক্রিয়াদি উক্ত সুনির্দিষ্ট লয়ের বা তালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অতএব জগতে বিনা তালে লয়ে কোনও ক্রিয়াদি সম্ভব নয়।

সংগীতে লয় বা তালের প্রয়োগ জাগতিক কার্যাদির মত নিয়ম বহির্ভূত কিছু নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে সংগীতের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাল সৃষ্টি হয়েছে সংগীতেরই প্রয়োজনে। এর প্রমাণ আমরা পাই আমাদের পুরাণাদি, শাস্ত্র, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদির মধ্যে। ডমরুপাণি মহাদেবের কল্পনা তালোৎপত্তির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। বেদে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতা, অজন্তার দেওয়াল চিত্র, প্রাচীন মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির নানা বাদ্যযন্ত্রের ছবি উৎকীর্ণ করা আছে। এই সকল বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে কয়েকটির নাম আমরা জানি, যেমন বৈদিক যুগে আমরা পাই বনস্পতি, দর্দুর, আঘাতি, আদম্বর, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ইত্যাদি; রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে পাই পর্ণব, মুরজ, ভেরী, পটহ, মর্দল, নন্দী ইত্যাদি। সংগীতে লয়ের প্রয়োজনেই এই সকল বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ এবং বৈচিত্র্য।

সংগীতের লয় প্রাকৃতিক লয়ের মত একই ছন্দে আবর্তিত নয়। লয়বৈচিত্র্য সংগীতের একটি অন্যতম সর্ত। তাই সংগীতে নানা ছন্দের লয় দেখা যায় এবং ছন্দবৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন লয়কে সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় সীমিত করে তাকে একাধিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই ভাবে যে তালগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি পৃথকীকরণের জন্য তাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—লক্ষ্মীতাল, ব্রহ্মতাল, চৌতাল, ত্রিতাল একতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

সংগীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাল অপরিহার্য। তাল মাহাত্মের জন্যই সংগীত হয়েছে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং গতিশীল। তাল-লয়হীন সংগীতকে একটি নিষ্প্রাণ মনুষ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবন যেমন ছন্দোময়, তাল সংগীতকে সেইপ্রকার ছন্দোময় করেছে। তাল লয়যুক্ত সংগীত মানুষ তো দূরের কথা পশু-পাখীর হৃদয়েও এক অনাস্বাদিত আনন্দের

শিহরণ এনে দেয়। তাই বলা হয় যে সংগীতের দ্বারা হিংস্র পশুকেও বশে আনা যায়।

তালের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মানুগ পথেই সংগীতের পূর্ণতা সাধন হতে পারে। অন্যথায় সংগীত অপূর্ণ থেকে যায়। তাই বেতাল নৃত্য, গীত বা বাদ্য কারও প্রাণে সাড়া জাগান তো দূরের কথা বিরক্তিতে মন আচ্ছন্ন করে। উচ্চকোটীর শিল্পী তাকেই বলা হয় যার অন্যান্য গুণের সঙ্গে লয়-কুশলতা বিদ্যমান।

সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা দেখি যে সংগীতে অপ্রতিহত ভাবে তাল তার প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ একদিকে যেমন বাদ্যযন্ত্রাদির বিবর্তন ঘটছে অপরদিকে তেমনই নানা তাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই; কারণ সংগীতের শৃঙ্খলা, সংযম, মাধুর্য সকলই তালের উপর নির্ভরশীল।

"ভক্তি রত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন,

"গীতে তালযুক্ত তালবিনা শুদ্ধি নয়।
যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয়॥

অপ্রচলিত তালকে প্রচলিত করবার উপায় বা আবশ্যকতা

নতুন সৃষ্টির দ্বার যখন ক্ষণেকের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়, অথচ গতানুগতিকতায় শিল্পীমন অতৃপ্ত তখন পুরাতনকে নতুনের মর্যাদা দিয়ে পুনরায় আবাহন করে আনা হয়। তাল প্রক্রিয়াদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। রাগ-রাগিনীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে এক এক সময় অপ্রচলিত রাগের অত্যাধিক্য ঘটে। কারণ প্রচলিত রাগ গায়নে যখন শিল্পী বা শ্রোতা কেউই তৃপ্ত হয় না তখন নূতনত্বের প্রয়োজনে প্রচলিতের মাঝে অপ্রচলিতদের আগমন ঘটে।

নির্বাসিত তাল অর্থাৎ যে তালগুলিকে একেবারেই ব্যবহার করা হয় না সেইগুলিকে আমরা অপ্রচলিত তাল বলি এবং বহুল ব্যবহৃত তালগুলিই প্রচলিত তালের পর্যায়ে পড়ে। তবে বহুল প্রচলিত একাধিক তালের মধ্যে আবার কয়েকটির প্রাধান্য অত্যধিক বেশি, যেমন—দাদ্‌রা, কাহারবা, ত্রিতাল

এবং একতাল। অপ্রচলিত তালগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দুই একটি শোনা গেলেও অধিকাংশ বর্তমানে পরিত্যক্ত, যেমন—শিখর, গণেশ, লক্ষ্মী, ব্রহ্মতাল ইত্যাদি। অল্প প্রচলিত তথা প্রায় অপ্রচলিত তালাদির মধ্যে ঝুমরা, আড়া চৌতাল, সুলতাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অপ্রচলিত তালগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রচলিত করা চলতে পারে :—

(১) ধীরে ধীরে প্রচলিত তালাদির মধ্যে অপ্রচলিত তালগুলির অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে।

(২) তবলা বা পাখোয়াজের একক বাদনে (Solo) অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অপ্রচলিত তালে গায়ন বা বাদনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) প্রয়োগ সহ আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করে সংগীত-প্রেমীদের অপ্রচলিত তালের মাহাত্ম্য অনুধাবনে সহায়তা করতে হবে।

(৫) রেডিওতে অপ্রচলিত তালের গীত এবং বাদ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৬) অপ্রচলিত তালোপযোগী গীত রচনা করতে হবে।

(৭) সংগীত বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে অপ্রচলিত তালগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেইগুলি শিক্ষাদানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) সর্বোপরি, অপ্রচলিত তালে নিপুণ শিল্পীকে পুরস্কৃত কিংবা অন্যভাবে সম্মানিত করে উৎসাহ দিতে হবে।

অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রচলিত করবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলে একমত নন। একদলের মতে এর আবশ্যকতা আছে এবং বিপক্ষদলের মতে এর কোনও আবশ্যকতা নেই। প্রথম দল তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান :—

(১) সংগীতে নতুনত্বের প্রয়োজনে অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রচলিত করতে হবে।

(২) অপ্রচলিত তালগুলি আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের দ্যোতক; অতএব এগুলি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

(৩) জ্ঞানকে প্রচলিত তালাদির মধ্যে সীমিত না রেখে অপ্রচলিত তালের আলোচনা এবং প্রয়োগ করে তার পরিধি বিস্তার করা উচিত

দ্বিতীয় অর্থাৎ বিপক্ষদল উপরি উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন—

(১) প্রচলিত তালের সংখ্যা এত অধিক যে সবগুলিকে সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারলে নতুনত্বের জন্য অপ্রচলিত তাল আমদানী করবার কোন আবশ্যকতা নেই। প্রচলিত তালগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে অধিক প্রাধান্য দেবার জন্যই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

(২) অপ্রচলিত তালগুলি যুগোপযোগী নয়।

(৩) মৃতকে পুনর্জীবন দেবার প্রচেষ্টা না করে সময়োপযোগী নতুন কিছু সৃষ্টি করা উচিত; কারণ, নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বারা আমাদের সংগীত জগৎ সমৃদ্ধ হতে আরও সমৃদ্ধতর হবে।

দুটি মতই আলোচনা করে আমাদের মনে হয় যে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন সব সময় থাকলেও অপ্রচলিত তালগুলির প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায়। অবশ্য এইগুলিকে যুগোপযোগী করে নেওয়া যায় কিনা সে কথা তাল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। পরিচিতদের মধ্যে হঠাৎ নতুন কোনও আগন্তুক এসে কিছু যে অবাক বিস্ময়ের সঞ্চার হয় সেকথা অনস্বীকার্য।

আধুনিক তাল তথা প্রাচীন তাল

ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত তালের একটি ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে এই। বিবর্তনের জন্য কিছু কিছু প্রাচীন তাল লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কয়েকটির রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে সাধারণভাবে প্রাচীন তালগুলির ভিত্তির উপরেই আধুনিক তালগুলির কাঠামো দণ্ডায়মান।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে আমরা দুই প্রকার তালের উল্লেখ পাই—মার্গতাল ও দেশীতাল। মার্গসংগীতে ব্যবহৃত তালগুলিকে মার্গতাল এবং দেশী সংগীতে ব্যবহৃত তালগুলিকে বলা হত দেশী তাল। বিভিন্ন

মাত্রাসংখ্যাসম্পন্ন নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার মার্গতালের উল্লেখ পাওয়া যায় :—

তালের নাম	মাত্রা সংখ্যা
(১) চাচপুট :	৬
(২) উদঘট্ট :	৬
(৩) চচৎপুট :	৮
(৪) ষট্‌পিতাপুত্রক :	১২
(৫) সম্পর্কেষ্টাক :	১২

শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, মহাদেবের পাঁচটি মুখ – সদ্যজাতঃ, বামদেবঃ, অঘোরঃ, তৎপুরুষঃ এবং ঈশানোঃ হতে উপর্যুক্ত পাঁচটি তাল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রাচীন মার্গ বা গন্ধর্ব তালে, লঘু, গুরু, প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রা এবং দেশীতালের লঘু, গুরু, প্লুত ও দ্রুত—এই চার প্রকার মাত্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে আমাদের তাল পদ্ধতিতে দেখা যায় ছয় প্রকার মাত্রার প্রচলন, যথা লঘু=১ মাত্রা, গুরু=২ মাত্রা, প্লুত=৩ মাত্রা, কাকপদ=৪ মাত্রা, দ্রুত=½ মাত্রা এবং অনুদ্রুত=¼ মাত্রা। হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে উপরিউক্ত কাকপদ বাদে অপর পাঁচটি প্রকার মাত্রার উল্লেখ আছে। মাত্রা ব্যতীত প্রাচীন তালের দশটি বিষয় উল্লেখ করে তাদের তালের দশ প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যথা : কাল, মার্গ ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার।

(বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

বর্তমান কালে ভারতীয় সংগীতে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের পদ্ধতিকে বলা হয় কর্ণাটকী পদ্ধতি এবং উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতি। নিম্নে সংক্ষেপে এই দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে প্রধান সাতটি তালে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে এই পদ্ধতিতে ১০৮টি তালের ব্যবহার ছিল যাকে বলা হত অষ্টত্তরশততালম্। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৮টি তাল কমে এসে ৩৫টি তালে দাঁড়ায় এবং তখন একে বলা হত অপূর্ব-তালম্ এবং এই ৩৫টি তাল হতে বর্তমানে ৭টি প্রধান তাল ব্যবহৃত হচ্ছে যাদের বলা হয় সপ্ততালম্।

(বিস্তারিত আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি হতে আধুনিক হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তাল বিভাগে ফাঁকের কোন স্থান নেই, কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে 'ফাঁক'-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। মোটামুটি ভাবে তালের সমতা রক্ষার্থেই ফাঁকের ব্যবহার করা হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে পাঁচ প্রকার মাত্রার প্রয়োগ করা হয়। সমগ্র হিন্দুস্থানী তালকে তিস্র, চতস্র এবং মিশ্র - এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। ত্রিমাত্রিক ছন্দের তালগুলি তিস্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন দাদরা। চতুর্মাত্রিক ছন্দের তালগুলি চতস্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন কাহারবা, ত্রিতাল ইত্যাদি এবং অন্যান্য তালগুলি মিশ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন তীব্রা (৩।২।২) ঝাঁপতাল (২।৩।২।৩) ইত্যাদি।

আধুনিক কালে গীতের প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন তালের প্রয়োগ হয়, যেমন—ধ্রুপদাঙ্গের গানে চৌতাল, ধামার ইত্যাদি, খেয়ালাঙ্গের গানে ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি; ঠুংরী অঙ্গে যৎ, আদ্ধা ইত্যাদি, টপ্পা অঙ্গে পাঞ্জাবী, যৎ ইত্যাদি এবং লঘু সংগীতে দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি। সাধারণতঃ তালগুলি উপরিউক্তভাবে ব্যবহৃত হলেও একাধিক তাল আছে যা একাধিক অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ঝাঁপতাল ধ্রুপদাঙ্গে ও খেয়ালাঙ্গে, ত্রিতাল খেয়ালাঙ্গে ও ঠুংরী অঙ্গে, যৎ ঠুংরী অঙ্গে ও টপ্পা অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক তালগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, "ছন্দানুযায়ী এক

একটি তালের বিশেষ গতি আছে—কারও বিলম্বিত, কারও বা মধ্যগতি, কারও দ্রুতগতি।

আধুনিক ও প্রাচীন তাল পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তালের রূপগত, গুণগত তথা পদ্ধতিগতভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য সংগীতে তালের স্থান

ভারতীয় সংগীতে গীত বা বাদ্যের সঙ্গে তালের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকলেও এর মধ্যে তাল রহিত অংশও আছে, যেমন—আলাপচারী। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে তালের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন অংশ নেই, কারণ সেখানে ভারতীয় সংগীতের মত কোনও আলাপচারী করা হয় না। তাই পাশ্চাত্য সংগীতে তালের গুরুত্ব খুবই বেশী।

ভারতীয় সংগীতে মাত্রাসংখ্যা এবং ছন্দানুযায়ী অজস্র তালের সৃষ্টি হয়েছে এবং গীত, বাদ্য বা নৃত্যের ছন্দানুযায়ী বিশেষ বিশেষ তাল তাতে প্রয়োগ করা হয়। অনবদ্ধ-জাতীয় বাদ্যগুলি এই তালকার্য সাধিত করে। তাই ভারতীয় তাল পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। পাশ্চাত্য সংগীতে তাল ব্যবস্থা এত জটিল নয়। কারণ সেখানে তাল বা মাত্রাকে সময় (Time) হিসাবে পরিগণিত করা হয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তাল বিভাগের মত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই সময় বিভাগ করা হয় একটি দণ্ডের মত রেখার সাহায্যে। এই রেখাগুলিকে বলা হয় (BAR) যে কোনও রচনায় (Composition) একটি বার (BAR) হতে অপর (BAR)-এর দূরত্ব সমান রাখা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেকটি বারের সময়কাল বা স্থায়িত্ব সমান। প্রত্যেকটি বারের বা প্রতি বিভাগের সময়কাল কতটা হবে স্বরলিপির প্রথমেই দুটি সংখ্যার সাহায্যে তার নির্দেশ দেওয়া থাকে এবং এই সংখ্যাদুটিকে বলা হয় টাইম সিগনেচার (Time Signature)। এই দুটি সংখ্যার মধ্যে উপরের সংখ্যাটি একটি বার বা বিভাগের অন্তর্গত স্বরসংখ্যার নির্দেশক।

পাশ্চাত্য সংগীতে তাল বিভাগগুলির মধ্যে কোনও জটিলতার অবকাশ নেই। কারণ তারা সময়কে (Time) দুটি ভাগে বিভক্ত করে একটির নাম

দিয়েছেন সরল সময় (Simple Time) এবং অপরটির নাম দিয়েছেন মিশ্র (Compound Time)। সরল সময়ের (Simple Time) আবার তিনটি উপবিভাগ আছে, যথা—

(১) ২/২ ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ ডুপ্ল্ টাইম (Simple Duple Time) বা ডাব্ল্ মেজার (Double Measure)।

(২) ৩/৩ ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ ট্রিপ্ল্ মেজার (Simple Triple Measure)।

(৩) ৪/৪ ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ কোয়াড্রুপল্ মেজার (Simple Quadruple) Measure)।

উপরি উক্ত ডুপ্ল্ (Duple) এবং কোয়াড্রুপ্ল্কে (Quadruple) আবার কখনও বলা হয় কমন টাইম (Common Time)।

প্রত্যেকটি স্বর কত মাত্রা স্থায়ী হবে সেটি বোঝাবার জন্য পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরগুলির বিভিন্ন নাম এবং চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেমন—

১ মাত্রা = সেমিব্রিভ (Semibreve)
১/২ ,, = মিনিম (Minim)
১/৪ ,, = ক্রচেট (Crotchet)
১/৮ ,, = কোয়েভার (Quaver)
১/১৬ ,, = সেমি কোয়েভার (Semiquaver)
১/৩২ ,, = ডেমিসেমিকোয়েভার (Demisemiquaver)
১/৬৪ ,, = সেমিডেমিসেমিকোয়েভার (Semidemisemi quaver)

ভারতীয় তালগুলির মধ্যে বহু তাল আছে যেগুলির অসমবিভাগ। পাশ্চাত্যেও অসম বিভাগসম্পন্ন তাল আছে, কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ খুবই সীমিত।

"In rare instances, irregular times are to met with such as alternate bars of $\frac{3}{4}$ and $\frac{2}{4}$ or the two joined together making $\frac{5}{4}$". (Elements of music—E Devenport, P-13).

পাশ্চাত্য সংগীতে তালের অপ্রতিহত প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় সংগীতে তালের প্রাধান্য থাকলেও তা সর্বত্র গীত বাদ্য বা নৃত্যানুসারী। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে তাল ও সুর হাত ধরাধরি করে চলেছে, একটির অভাবে অপরটি পঙ্গু। তালের এই প্রাধান্যের জন্য তালবিভাগ বা সময় বিভাগকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত করা হয়েছে। তালের জন্য পাশ্চাত্য দেশে আমাদের মত অবনদ্ধ জাতীয় কোনও বাদ্যযন্ত্র নেই, তারা ব্যবহার করেন Metronome নামে এক প্রকার যন্ত্র। 'সংগীত দর্পন'-কার দামোদর মিশ্র গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকে মত্তগজের সঙ্গে এবং তালকে অঙ্কুশের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

"তৌর্য্যত্রিকং চ মত্তে ভস্তালে স্তম্ভাঙ্কুশংবিদু।"

পাশ্চাত্য সংগীতে তালের স্থান নির্ণয়ে দামোদর মিশ্রের এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংগীত ও বৃন্দবাদন

ইংরাজী ORCHESTRA-কে আমরা ভারতীয় সংগীতে বৃন্দবাদন বলে অভিহিত করি। সাধারণভাবে একসঙ্গে একাধিক বাদ্যের পরিবেশনকে আমরা বৃন্দবাদন বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে একসঙ্গে একাধিক বাদ্য পরিবেশিত হলেও প্রতিটি বাদ্যের বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং একজন নির্দেশকের পরিচালনায় বৃন্দবাদন অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দবাদনে প্রত্যেক বাদককে তার সুনির্দিষ্ট ছক বাঁধা পথে অগ্রসর হতে হবে।

পাশ্চাত্য জগতেই বৃন্দাবাদনের প্রথম উদ্ভব হয় এবং বিটোফেন, মোজার্ট, স্যুবার্ট প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় বৃন্দবাদনের অভাবনীয় প্রসার ও উন্নতি ঘটে।

ইংরাজীতে CONCERT বলে আর একটি শব্দ আছে সেটিরও বাংলা অর্থ বৃন্দবাদন। কিন্তু CONCERT এবং ORCHESTRA-র মধ্যে পদ্ধতিগত এবং গুণগত প্রভেদ আছে। CONCERT-এর ক্ষেত্রে সবগুলি যন্ত্রকে একই সুরে বেঁধে নিয়ে সমবেতভাবে একই গৎ বাজান হয়ে থাকে এবং এর জন্য যথেষ্ট রিহার্সালের প্রয়োজন থাকলেও পরিচালকের (CONDUCTOR) প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আগেই

বলা হয়েছে যে বৃন্দাবাদনে নির্দেশকের প্রয়োজন আছে, কারণ এখানে বিভিন্ন সুরের যন্ত্রগুলি বাঁধা হয় এবং পরিচালকের নির্দেশ মত বাদকেরা চলেন। তাই CONCERT-কে বাংলায় 'সমবেত ঐক্যবাদন' বললে ভাল হয়।

পাশ্চাত্য দেশ হতে এই বৃন্দাবাদন ধীরে ধীরে ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ভারতীয় সংগীতে বর্তমানে বৃন্দাবাদন পাশ্চাত্যানুসারী হলেও প্রাচীন কালে যে ভারতে বৃন্দাবাদন প্রচলিত ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার মধ্যে একাধিক যন্ত্রের একত্র বাদনের প্রমাণ আছে।

ভারতীয় সংগীতে বৃন্দবাদন পদ্ধতি অজানা না থাকলেও এটি বিজ্ঞান-সম্মত চর্চাভাবে সংগীতের অন্যান্য শাখার মত সমৃদ্ধ হয়নি। এর একাধিক কারণ আছে· প্রথমতঃ, ভারতীয় সংগীত অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির মৌলিকত্ব প্রকাশই প্রধান হয়ে পড়ে। সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যে এই মৌলিকত্বের অপমৃত্যু ঘটে। রাগাদি পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ম—কানুনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও রাগালাপ, রাগবিস্তার, তান, বোলতান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৌলিকত্ব প্রকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত, যেখানে শিল্পী স্বচ্ছন্দ বিহারের অনাবিল আনন্দে মশ্‌গুল, নব নব সৃষ্টির আনন্দে বিভোর। বৃন্দাবাদনের কঠিন বাঁধনে মৌলিকত্ব প্রকাশের সকল দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে ভারতীয় শিল্পীর হৃদয়ে বৃন্দবাদন কোনদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবাদনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট বোঝাপড়া না থাকলে বৃন্দবাদনে সাফল্য লাভ করা যায় না। কারণ বিভিন্ন বাদ্যের সম্মিলিত প্রয়োগেই এর প্রত্যাশিত রস-সৃষ্টি হতে পারে, অন্যথায় রসহানি ঘটে। তৃতীয়তঃ, এই বিষয়ে উন্নতির জন্য নিতান্ত আধুনিক কাল ছাড়া পূর্বে কোন সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সংগীতে প্রায়—গতিহীন বৃন্দবাদনে যে গতিসঞ্চার হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং এই বিষয়ে মাইহারের উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে জনকের সম্মান দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ তিনি সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়ে "মাইহার ব্যাণ্ড" নামে একটি

দল গঠন করে বৃন্দবাদন শিক্ষা দিতে সুরু করেন এবং তাঁর সুশিক্ষার গুণে অতি অল্পকালের মধ্যে 'মাইহার ব্যাণ্ড' সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্রমে ক্রমে তিমিরবরণ, রবিশঙ্কর, শিরালী প্রভৃতি বৃন্দবাদনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। বাংলার শ্রীসনাতন মুখার্জী রাগাদি অবলম্বনে বৃন্দবাদনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালিত করে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

বৃন্দবাদনের উন্নতি সাধনে দিল্লী আকাশবাণীর "রাষ্ট্রীয় বাদ্যবৃন্দ" পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য এবং এই বিভাগটির প্রচেষ্টায় আমরা রবিশঙ্কর, পান্নালাল ঘোষ প্রমুখ প্রতিভাবান পরিচালক এবং উৎকৃষ্ট রচনা উপহার পেয়েছি। বৃন্দবাদনের বর্তমান অগ্রগতির জন্য ছায়াচিত্রের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতীয় বৃন্দবাদন অনেক পিছনে পড়ে আছে। তাই এর উন্নতির জন্য সকল দিক হতে সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

তবলা লহরা (Solo) বাদনে উন্নতি

নৃত্য, গীত বা বাদ্যের সহযোগী যন্ত্ররূপে তবলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খোল, পাখোয়াজ জাতীয় অনবদ্ধ বাদ্য ব্যবহৃত হলেও তবলার প্রাধান্যই সব থেকে বেশী; তাই তবলার জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান।

লয় বা তাল প্রদর্শনই তবলার কাজ এবং তালকে সংগীতের প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সহযোগী বাদ্য ব্যতীতও একক তবলা বাদন বিশেষ আকর্ষণীয়। এই একক বাদনকেই আমরা লহরা বা Solo বাদন বলে থাকি। কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতে কয়েকটি স্বাভাবিক সুযোগ থাকবার জন্য এর দ্বারা সহজেই জনচিত্ত জয় করা যায়। কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগ রূপায়ণে অথবা লঘু সুরের একটি পৃথক উন্মাদনা বা আবেদন আছে। তবলায় ঠিক এই ধরণের সুযোগ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর একটি পৃথক আবেদন আছে এবং তবলার প্রয়োগ কৌশলের উপর তা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই তবলালহরা বাদনে রসসৃষ্টি করতে হলে যথাযথ তালিম ও সুশিক্ষার প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে তবলা লহরা নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছে। তাছাড়া আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র হতেও তবলা লহরা বাদন প্রায়ই প্রচারিত হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে সংগীতপ্রেমী জনসাধারণ এই বাদ্যটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং এই জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হলে লহরা বাদনকে উন্নত হতে আরও উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যসাধনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ রাখতে হবে।

প্রথমতঃ, বিজ্ঞানসম্মত অঙ্গুলীচালনা শিখতে হবে। কারণ সঠিক অঙ্গুলীচালনা না করতে পারলে বোলগুলির দ্রুত স্পষ্ট রূপায়ণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, তবলা লহরা বাজাতে হলে সঠিক পদ্ধতিতে গুরুর কাছে দীর্ঘকাল তালিম নেবার প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন ছন্দের কাজ, রেলা, কায়দা, পরণ ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগনৈপুণ্যের উপরই লহরার সার্থকতা নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ, সাধারণভাবে তবলা সংগত করা অপেক্ষা লহরা বাজান অনেক কঠিন। কারণ লহরা বাজাতে হলে জ্ঞানের গভীরতা অর্থাৎ তালের হিসাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে।

তবলা লহরা বাদনে উন্নতির জন্য উপরি উক্ত কারণগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে আরও কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। যেমন—

(১) একক তবলা বাদনের (Solo) প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(২) আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে প্রখ্যাত তবলা-বাদকদের একক বাদনের ব্যবস্থা করা।

(৩) পুরস্কার ইত্যাদির দ্বারা একক বাদনকে উৎসাহ দেওয়া।

কয়েকজন ভারত বিখ্যাত তবলা-বাদকের প্রচেষ্টায় তবলা লহরা বাদন বর্তমানে যথেষ্ট উন্নত এবং জনপ্রিয় হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কণ্ঠে মহারাজ, অহমেদজান থেরাকুয়া, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সামতাপ্রসাদ, আল্লারাখা, কেরামত খাঁ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রীয় সংগীতকে লোকপ্রিয় করবার উপায়

শাস্ত্রকে আঁধার করে যে সংগীত তাকেই বলা হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তিমূল হ'ল তাই তার শাস্ত্র। দেশীয় সংস্কৃতির এক অবিভাজ্য অঙ্গ এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। কিন্তু বর্তমান কালে তবুও এই সঙ্গীত লোকপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারেনি। কোন সঙ্গীত আসরে যখনই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুরু হয়, দেখা যায়, শ্রোতাদের অধিকাংশই এই প্রকার সঙ্গীত শুনতে অনিচ্ছুক। এর কারণ প্রধানতঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শ্রোতাদের অজ্ঞানতা। কিন্তু গভীরে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধুর্য গায়কের দোষে অনেক সময়েই নষ্ট হ'য়ে যায়। সংগীতে রঞ্জকতা গুণ না থাকায় তা শ্রোতামাত্রকেই আকর্ষণ করতে পারে না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত লোকপ্রিয় না হবার এটিও একটি অন্যতম কারণ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাই সর্ব সময়েই রঞ্জকতাগুণসমন্বিত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে শ্রোতার অজ্ঞানতা থাকলেও সঙ্গীতের অপার মাধুরিমায় সকল অজ্ঞানতার ধূসর ম্লান ক্লান্তি কেটে গিয়ে বিমুগ্ধ শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হবে অনাস্বাদিত রসের অপার আনন্দ।

আজকের যুগ আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর। মানুষ আজ সারা বিশ্বকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে। জীবন এখন অনেক জটিল। তাই তার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের মাঝে সে চায় সরলতা, সহজ ভাবের আকুলতা। সে ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব বহুলতাই এই সঙ্গীতে লোকপ্রিয়তার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে চায় মনোরঞ্জন। তাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে লোকপ্রিয় করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার ভিতরের সহজ সরল রূপটি জন-মানসে অঙ্কিত করে দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, গায়ককে তার শ্রোতার রুচির প্রতি অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচির উপরই সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তা সর্বাধিক নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ, সঙ্গীতকে লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে হলে শ্রোতার সেই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ সঙ্গীতশাস্ত্রে

অজ্ঞান কোন ব্যক্তির পক্ষে সে সঙ্গীতের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর এবং আলোচনার মাধ্যমে জনগণের অজ্ঞানতা দূর হতে পারে। সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম উপায়।

চতুর্থতঃ, আঞ্চলিক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গূঢ় তত্ত্বগুলিকে সহজভাবে সকলের মাঝে বিতরণ করা যায় তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝে নিহিত যে সুরব্যঞ্জনা তা নিশ্চয়ই জনসাধারণ কর্তৃক আদৃত হবে।

পরিশেষে, আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাধান্য এবং চলচ্চিত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ শাস্ত্রীয় সংগীতকে লোকপ্রিয় করবার সহজতর উপায়।

ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত

ভারতবর্ষের সঙ্গীত অধ্যাত্ম-সাধনারই সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান। নাদকে বলা হয়েছে পরম ব্রহ্ম।

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ"।

সঙ্গীতই পরম প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছে। ভারতীয় জীবনে পূর্ণ শিক্ষা পেতে হলে সঙ্গীত একান্তই প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে দেশ। এই রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে গীত হয়ে যুগ যুগ ধরে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেছে।

ভারতীয় আদর্শ ও তার ভাবধারার সাথে সঙ্গীতের এমনই একটা নিবিড় সম্পর্কে যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভাবা যায় না।

এই অর্থে জীবন ও সংগীত একই বোধিতে ধ্বনিত।

জীবনের প্রথম যেদিন আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন আপাতঃভাবে হয়ত কোন সঙ্গীত শ্রুত হয়নি, কিন্তু জীবনের প্রতিটি অন্তঃপ্রকৃতির কাছে অশ্রুত সঙ্গীত নিশ্চয়ই ছিল। সেইক্ষণ থেকেই জীবনের প্রতিটি অঙ্গনেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাটি ধ্বনিত হয়ে এসেছে।

ভারতীয় জীবনে এই ভাবেই এল সঙ্গীত। সঙ্গীতের মাঝে নিহিত আছে যে দিব্যানন্দের স্পন্দন, ভারতবর্ষ প্রথম হতেই তাকে উপলব্ধি

করেছিল। তারপর থেকে তার জীবনে, ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে এসে যুক্ত হল সঙ্গীতের আকৃতি।

প্রাচীন বৈদিক যুগে তাই যে সঙ্গীত অধ্যাত্ম সাধনারই প্রতিরূপ ছিল, আজ তা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রসারিত।

ভারতীয় জীবনের একটি প্রশান্ত রূপ আছে, বিশ্বজীবনের আর কোথাও যার তুলনা মেলা ভার। যদি বলি সেই কান্তিটি এনে দিল কে? তার উত্তর পেতে দেরী হয় না। জীবনের প্রথম আবির্ভাবে সঙ্গীতকে সে নিয়েছিল বলেই ভারতীয় জীবন রূপ ও কান্তিময়তা পেয়েছে। কারণ সঙ্গীতের মূল কথাটি তার সুর। সুরনির্ঝরের প্রবাহে ভারতীয় জীবনের অনুভূতিতে এক অপার্থিব চেতনার সঞ্চার হল এবং সেই চেতনায় সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করল।

অচেতন থেকে চেতনার স্তরে, অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানের আলোকে, অসুন্দর হতে সুন্দরের সাধনায় মগ্ন আধ্যাত্মিক ভারতের জনজীবন সংগীতের মাধ্যমেই পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ। তাইতো জীবনের সর্বস্তরে চলেছে সুরের সাধনা। কারণ সেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমকে' তো সুরলোকেই অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'সাম-গানের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনানুভূতির আনন্দলোকে বিচরণ করতেন। এই দেশের মাটিতেই বহু সাধক কেবলমাত্র সংগীতকে অবলম্বন করে ঈশ্বর-লাভের সাধনার দুস্তর পারাবার হেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাইতো শ্রী-শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন,

> "যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।"

ভারতীয় জীবন ও সংগীত অবিচ্ছিন্ন। সর্ববিদ্যার মধ্যে সংগীতকেই তাই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়ে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,

"ন চ বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

নারদকে শ্রীভগবান বলেছেন—

> "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
> মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

তবলা সঙ্গতের উদ্দেশ্য ও বিধি

সঙ্গীত হ'ল সুরের উচ্ছাস। রবীন্দ্রনাথ সুরকে বলেছেন যে সে হল একটা গতি। কিন্তু সে গতির মাঝে তো চাই প্রাণের জোয়ার, তার মাঝে তো চাই সবুজ প্রাণীনতা; মুক্ত প্রাণের স্পন্দন। কে আনছে সেই প্রাণধ্বনি। সে তো সঙ্গত। সেই তো আনছে গতির মাঝে বনমর্মর, প্রাণোচ্ছলতা আর অনবচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ। তার মধ্যে আছে ছন্দ, তার মাঝে আছে লয়। ছন্দ ও লয়ের মণিকাঞ্চন যোগে মানুষের মনকে সঙ্গীত সুদূরের সুন্দরের কাছে নিয়ে যায়। আর যখন সঙ্গীতের মাঝে সঙ্গত শুনছি, তখন আর সে সুন্দরটি কেবল দূরপ্রান্তের দিকেই সীমাবদ্ধ রইল না, তার আবেদনটি চিরকালীন হ'য়ে গেল, চিরকালের সুন্দরের ঝরণায় সে তরঙ্গ তুলে গেল, চিরসুন্দরের উপলব্ধিতে দোলা দিয়ে গেল সে। দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা যে সুন্দরের সম্মুখীন হলাম, সঙ্গত তাকে চিরকালীন করে রাখছে।

সঙ্গীত পরমানন্দের দুয়ারে গুঞ্জরণ তুলল, আর যখন সে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে গেল সংগতকে তখন সে আনন্দবীথিকায় বহে গেল রসের জোয়ার। সংগীত সুরকে করল উত্তরণ, আর যখন সংগত এসে জোড় বাঁধল তার সাথে, সুরের ঘটল মুক্তি।

সংগীতকে সে পরিপূরণ করেছে। মিলন ঘটাচ্ছে সে সুরের আর ছন্দের, একই সপ্রাণতায় উত্তরিত করছে সে গতি আর প্রাণময়তাকে। সেখানেই তো সংগীতের মাঝে শুনি অপার্থিব ঐকতানের মূর্চ্ছনা।

এই অপার্থিব ঐকতানের দোলা লাগানই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপার্থিব ঐকতানটি কি? সে হোল পার্থিবতা ছাড়িয়ে মিলিত স্বর, সুরধ্বনির যে ব্যঞ্জনা তা। অপার্থিবের যে অনুভূতি, সংগীত তা সৃষ্টি করল, আর তাতে ঐকতানের আকুতি যুক্ত করল সংগত। সংগতের কাজটি প্রধানতঃ এই মিলিত স্বরগুঞ্জনের মাঝে যে চিরন্তন ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে আছে তাকে ফুটিয়ে তোলা। দেখতে পাচ্ছি সংগীতের সাথে চলে সংগত তাকে দিচ্ছে রূপ।

সংগতের একটা গতি আছে। কিন্তু সুরের যে গতি তার আবেদন আলাদা। সংগতের গতির মাঝে আছে প্রাণ; আর সুরের গতির মধ্যে আছে একটা মিষ্টিক অনুভূতি। সংগীতের সঙ্গে গলা ধরাধরি করেও সংগীতকে পূর্ণ করে তুলতেই সে চলেছে, কিন্তু তার কাজ হবে না কোন সময়েই সুরকে ছাড়িয়ে যাওয়া। সংগীতে সুরটিই বড় কথা, সংগত তার অধীন। কিন্তু অধীনে থেকেও সে সংগীতের দেবে মুক্তি, কখনই নিজের প্রাধান্য ঘোষণায় সোচ্চার হবে না।

সংগতের মহত্ব

সংগীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপযুক্ত ভাবের প্রকাশ করে যথাযথ রসসঞ্চার করা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...কেবলমাত্র সুরসৃষ্টি, ভাবনা থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র—সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই" (সংগীত ও ভাব)। সংগত এই ভাব সৃষ্টির অনেকটা সহায়তা করে।

আমরা জানি যে গীত, বাদ্য কিংবা নৃত্যের একটা নিজস্ব গতি তথা ছন্দ আছে এবং এর কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়। বিশেষ বিশেষ গীত বাদ্য বা নৃত্য বিশেষ বিশেষ রসের দ্যোতক এবং এই ত্রয়ীর কোনটিরই একক মূল্য ততটা নেই। যেমন গানের সহযোগী যন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা, বেহালা, বাঁশী ইত্যাদি যে কোনও একাধিক বাদ্যযন্ত্র থাকে—গানের সৌকর্য তথা ভাবকে আরও বৃদ্ধি করবার জন্য। গীত, বাদ্য বা নৃত্যের সঙ্গে কোনও এক বা একাধিক যন্ত্রবাদনকে বলা হয় সংগত। সংগতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গীত-বাদ্যের সুর তালের মিলন বা তালানুগতি; আবার সংগীতের অবিরোধ ধারাকেও (Rhythm) সংগত বলা হয়। তবে সংগীতে মূলতঃ সুরের সঙ্গে তাল দেওয়াকেই বলা হয় সংগত। "সংগীত রত্নাকর" গ্রন্থকার বলেছেন, "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্।"

সংগত ছাড়া সংগীত প্রাণহীন। সংগতই সংগীতের মাধুর্যকে প্রকাশ করে জনচিত্ত রঞ্জনে সাহায্য করে। কথা, সুর এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সংগীতে অনুভাব আনয়ন করা হয়। সংগীতে নিছক সুর বা অঙ্গভঙ্গী যথাযথ ভাবপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলে পরিগণিত হয় না। উপযুক্ত সংগত সংগীতের উৎকর্ষতা তথা ভাবপ্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

কবিতার সঙ্গে এখানেই সংগীতের পার্থক্য। কবিতার ক্ষেত্রে কবি একক প্রচেষ্টায় তার সৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ করতে পারেন; কিন্তু সংগীতে সেটি হবার নয়। সংগীতকে (গীত, বাদ্য, নৃত্য) রসোত্তীর্ণ করতে হলে সংগতকে তার সহযোগীর মর্যাদা দিতে হবে।

সংগীতে তবলা অথবা মৃদঙ্গের মহত্ত্ব

অনবদ্ধ শ্রেণীর তাল বাদ্যের মধ্যে অন্যতম দুইটি বাদ্য হচ্ছে তবলা ও মৃদঙ্গ। এই দুইটি তালবাদ্যের মধ্যে উত্তর ভারতে তবলা এবং দক্ষিণ ভারতে মৃদঙ্গমের আধিপত্য সর্বাধিক। উত্তর ভারতে মৃদঙ্গের ব্যবহার খুবই সীমিত, অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে ধ্রুপদ ধামার গানে এবং কিছু যন্ত্রের সহযোগী বাদ্য হিসাবে মৃদঙ্গের প্রচলন আছে। সংগীতে এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে গেলে আমাদের তালের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সংগীত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তালও গলা ধরাধরি করে চলেছে। তবে যুগভেদে তার নানা পরিবর্তন হয়েছে। তালের উদ্দেশ্য কি? কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ গান ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে 'তাল' বলা হয়। "লয় প্রকাশ করণার্থ কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ করিতে হয়; সেই বলবৎ উচ্চারণের নাম 'প্রস্বন' (accent)। এক করতলের উপর অপর করতলের আঘাত দ্বারা অর্থাৎ কর-তালিদ্বারা ঐ প্রস্বন প্রদর্শিত হয় বলিয়া গান কালের ঐরূপ পরিমাণ করার নাম তাল রাখা হইয়াছে।" (গীতসূত্রসার—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৬-৪৭)। অর্থাৎ তাল না থাকলে সংগীতের সংযম, শৃঙ্খলা, চমৎকারিত্ব এবং সর্বোপরি গতি-সৌন্দর্য থাকে না এবং সেক্ষেত্রে সংগীত হবে নাসিকাহীন মুখের মত।

মুখপ্রধান দেহস্থ নাসিকা মুখমধ্যকে।
তালহীনং তথাগীতং নামহীনং মুখং যথা" [সংগীত-রত্নাকর]

সংগীতে এই গতি, লয় বা তাল বাদ্যের দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। ভারতীয় সংগীতে অনবদ্ধ বা ঘন জাতীয় তালবাদ্যের বহু প্রকার বিদ্যমান। তবে তাদের মধ্যে তবলারই প্রচলন সর্বাধিক এই কারণে যে সংগীতের একটা

ব্যাপক অংশের তালকার্য তবলার দ্বারাই সাধিত হয়। আবার ধ্রুপদ গীত বা বাদ্যে মৃদঙ্গ বাদন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে যা অন্য কোনও তালবাদ্য দ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সংগীতের চমৎকারিত্ব উৎপাদনে তবলা, মৃদঙ্গ ইত্যাদি তালবাদ্যের সহযোগিতা অপরিহার্য।

স্বর ও লয়

সংগীতের অন্যতম দুটি অঙ্গ হচ্ছে স্বর এবং লয়। স্বর ও লয়ের উপরেই সংগীতের মনোহারিত্ব তথা মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কেবল-মাত্র স্বরের সাহায্যে সংগীতের দেহ গঠিত হতে পারে, কিন্তু দেহে প্রাণসঞ্চার করবার জন্য প্রয়োজন লয় তথা তালের লয় বা তাল বলতে সংগীতের নিয়মাবদ্ধ ছন্দকেই বোঝায়; অর্থাৎ সংগীতে গতিকেই লয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আবার সংগীতে স্বর বলা হয়েছে সেই সকল ধ্বনিকে যা স্নিগ্ধ, অনু-রণনাত্মক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রোতৃচিত্ত রঞ্জন করে।

"শ্রুত্যনন্তরভাবী যঃ স্নিগ্ধোঽনুরণনাত্মকঃ।

স্বতোরঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে॥" সংগীত রত্নাকর

স্বরের সংখ্যা দ্বাদশ এবং এগুলি শ্রুতিরই রূপান্তর, যেমন দধি হচ্ছে ক্ষীরের রূপান্তর।

"শ্রুতয়ং স্বররূপেণ পরিণামং ব্রজন্তি হি।

পরিণামে যথা ক্ষীরং দধিরূপেণ সর্বদা॥"

স্বরকে আশ্রয় করে যে সংগীত তিলোত্তমা মূর্তি পরিগ্রহ করছে, লয়ই তাকে জীবন দান করে। কেবলমাত্র সংগীত নয়, ত্রিজগতের সবকিছুর উৎ-পত্তি "ত্রয়ং লোকে যতস্তালেন জায়তে।" অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্বর বা লয়ের কোনও একটিকে বর্জন করলে সংগীত সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। "ভক্তি রত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে তালহীন গীত "যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয়।" এই লয়েরও আবার আছে নানা প্রকারভেদ, যেমনঃ—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ইত্যাদি এবং লয়বৈচিত্র্য সংগীতের একটি অন্যতম সর্ত। সুরবৈচিত্র্যের সঙ্গে লয়বৈচিত্র্য মিলেমিশে

সংগীতে এক অনাস্বাদিত রসসৃষ্টি হয়। তাই হরগৌরীর মত স্বর এবং লয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

অবনদ্ধ বাদ্যের উন্নতির পথ ও সংগত করবার কলা

প্রচলিত অবনদ্ধ বাদ্যাদির মধ্যে পাখোয়াজ এবং তবলাই উল্লেখযোগ্য এবং এই দুটির মধ্যে আবার তবলার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। তবলা, পাখোয়াজ ব্যতীত ঢোল, নাকাড়া ইত্যাদি অন্যান্য অবনদ্ধ বাদ্য যে নেই তা নয়, তবে তাদের প্রচলন খুবই সীমিত। এই সকল অবনদ্ধ বাদ্যগুলির উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এগুলি ক্রম-বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা তবলার বিষয়ে অবশ্য এ সমস্যা নেই, কারণ ইতিমধ্যেই এই বাদ্যযন্ত্রটি সংগীত ক্ষেত্রে তার একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। তবে এর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি করবার কথা ভাবতে হবে এবং তা করতে হলে সংগীত সম্মেলন, রেকর্ড, রেডিও ইত্যাদিতে তবলা বাদনকে আরও প্রাধান্য দিতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচার হলে স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রের বিশেষ একটা চাহিদা বা taste গড়ে ওঠে। উপযুক্ত সংগীত প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে অবনদ্ধ বাদ্যাদি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেও এর উন্নতির পথ প্রশস্ত করা সম্ভব।

একক বাদন (solo) অপেক্ষা সংগতেই অবনদ্ধ বাদ্যাদি বেশী ব্যবহৃত হয় এবং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই বিষয়ে অর্থাৎ সংগতে তবলাই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত অবনদ্ধ বাদ্য। সংগতের উপরই যে কোনও সংগীতানুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। কারণ নৃত্য, গীত বা বাদ্যের মেজাজ অনুযায়ী সংগত করতে না পারলে সংগতের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই এক্ষেত্রে ওস্তাদি অপেক্ষা সুসংগতই শিল্পীর গুণপনার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। সুসংগতের প্রথম সর্ত হচ্ছে এই যে সংগতকার কখনোই শিল্পীর উপর নিজের প্রাধান্য প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হবেন না। তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে সার্থক সহযোগিতার মাধ্যমে যথাযথ রসসৃষ্টি করে স্বয়ং শিল্পী এবং শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করা; অর্থাৎ সংগতিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু প্রয়োগ করবেন না এবং যেটুকু করবেন তার মধ্যে aesthetic senseকে

অগ্রাধিকার দিয়ে সংগতকে সুললিত, মাধুর্যপূর্ণ ও শ্রুতি সুখকর করে তুলতে হবে।

একক ও সাথ বাজ

একক (solo) বাদন ও সাথ বাজ বা সাথ সংগত এই দুই প্রকারই সংগীত অনুষ্ঠানাদিতে বর্তমানে প্রভূত জনপ্রিয়। অন্যান্য যন্ত্রে যে একক বাদন চলে না, তা নয়। তবে সাধারণতঃ একক বাদন বলতে তবলালহরা অর্থাৎ কেবলমাত্র তবলাবাদন বোঝায়। তালবাদ্য হিসাবে তবলার জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। গীত, বাদ্য বা নৃত্যে তবলা সংগতেরই আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু তবলা এমনই একটি অবনদ্ধ বাদ্য যার নিজস্ব একটা আবেদন আছে এবং সেটি বোঝা যায় এই যন্ত্রটির একক (solo) বাদনে। একক বাদনের একটা বিশেষ ঢং (style) আছে। এই কারণে দেখা যায় যে তবলার প্রতিটি ঘরাণায় একক বাদনের একটি বৈশিষ্ট্য বা চাল গড়ে উঠেছে। একক বাদনের সুবিধা এই যে এতে শিল্পীর নিজের ঘরাণার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই দেখাবার অবকাশ থাকে যা সংগত কার্যে সম্ভব হয় না। এই কারণে একক বাদনে যে রসসৃষ্টি হয়, সংগতে তা হয় না। সংগতের ক্ষেত্রে শ্রোতারা কেবলমাত্র ঘরাণা বিশেষের স্ফুলিঙ্গ মাত্র দেখতে পান। কিন্তু একক বাদনে বিশেষ ঘরাণার সম্পূর্ণ রূপটিই তাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এখানেই একক বাদনের মাধুর্য ও সার্থকতা।

সাথ বাজ বা সাথসংগত চলে নৃত্য, গীত বা বাদ্যের গতি তথা ছন্দানুযায়ী ; অর্থাৎ শিল্পী যে ছন্দেরই প্রয়োগ করবেন, তবলা-বাদকও তবলায় তার সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে ও একই ছন্দে তাকে অনুসরণ করবেন। তাই সাথবাজেও বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার প্রয়োজন। কারণ সংগতকারী যদি যথেষ্ট পারদর্শী না হন তাহলে নৃত্য, গীত বা বাদ্যের যথাযথ রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। আবার শিল্পীর মেজাজ অনুযায়ী সংগত বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে রসোত্তীর্ণ করতে সাহায্য করে। তাই দেখা যায় যে সাথসংগতের গুণাগুণের উপর একটি অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া সাথ বাজে শিল্পীকে বিশেষ সংযমী হতে হয়। একক বাদনে তার যে স্বাধীনতা থাকে সাথসংগতে তা বিশেষভাবে সীমিত। নিজ নিজ ক্ষেত্রে

একক বাদন ও সাথসংগত এই দুয়েরই যে বিশেষ আবেদন আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় ঘনবাদ্য এবং সংগীতে উহার অবদান

"সংগীত দর্পণ" গ্রন্থে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির প্রকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"চতুর্বিধং তৎ কথিতং ততং শুষিরমেব চ।
অবনদ্ধং ঘনং চেতি ততং তন্ত্রীগতং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ বাদ্য চার প্রকার: তত, সুষির (বা সুশীর), অবনদ্ধ এবং ঘন।

উপর্যুক্ত চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্রাদিকেই বলা হয় ঘন বাদ্য, যেমন: ঘণ্টা, কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, কাষ্ঠতরঙ্গ, কম্পা, শুক্তি, পট্টাদি ইত্যাদি।

"তালোথ কাংস্যতাল স্যাদঘণ্টা চ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।
জয়ঘণ্টা ততঃ কম্পা শুক্তি পট্টাদয়স্তথা"॥ [সংগীত দর্পণ]

ঘন বাদ্যাদির আবার দুটি বিভাগ আছে: অনুরক্ত ও বিরক্ত। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ অনুরক্ত ঘনবাদ্যগুলিই সংগতকার্যে ব্যবহৃত হয় যেমন—করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি। বিরক্ত শ্রেণীর ঘনবাদ্যগুলি পূজানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়, যেমন—কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি।

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদির মত সংগীতে ঘন বাদ্যেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সংগীতে দেখা যায় যে যথাযথ রস সৃষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকারের বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেমন—খেয়াল গানে তবলা, ধ্রুপদ-ধামারে পাখোয়াজ, কীর্তন গানে খোল ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য এই যে বিশেষ গীত, বাদ্য বা নৃত্যের ভাবানুসারী যন্ত্রদ্বারা সংগত করে সেগুলিকে রসোত্তীর্ণ করতে সাহায্য করা। আমরা জানি যে সংগীতের সাফল্য যথাযথ সংগতের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ঘনবাদ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সংগীতের বিশেষ একটি শাখায় অর্থাৎ ভক্তিসংগীতে ঘনবাদ্য অপরিহার্য। কীর্তন ইত্যাদি গানে করতাল একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র। আবার ভাবসংগীতের একাধিক ক্ষেত্রে মন্দিরা অপরিহার্য যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মত ব্যাপকভাবে না হলেও সংগীতের সীমিত ক্ষেত্রে ঘনবাদ্যের প্রয়োজন আজও সর্বজনস্বীকৃত।

তালে তালি, খালি এবং বিভাগ রাখবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেকটি তাল এক একটি বিশেষ ছন্দানুসারী। তাল বিভাগ দ্বারা বিশেষ তালটির ছন্দ বোঝা যায়। সংগীতও ছন্দোময় এবং তার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। তাল দ্বারাই করা হয় সংগীতের হিসাব বিভাগের কাজ। এই হিসাব বিভাগের জন্য তালগুলির পরিচয়ে ঠেকা লিখবার সময় তালবিভাগ ছাড়াও সমসহ এক বা একাধিক তালি বা খালির চিহ্নও দেওয়া হয়ে থাকে। এই তালি, খালি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তালের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ভারতীয় তালে তালির স্থানগুলি এমন ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে তালির স্থানগুলিতে কিছু না কিছু ঝোঁক পড়ছেই। তবে এই ঝোঁকটা সব থেকে সমের স্থানেই প্রতিভাত হয় বেশি। সেইজন্য দেখা যায় যে তালের তালির স্থানগুলিতে 'ধা, ধিন্' ইত্যাদি বাণীর প্রাধান্য থাকে।

অপরদিকে খালির দ্বারা কোনো তালের প্রয়োগকে অনুধাবন করা সহজ হয়। খালির স্থানগুলি বোঝাবার জন্য সাধারণতঃ "না, তা, তিন্" ইত্যাদি বোল ব্যবহৃত হয়। খালির বর্ণ শুনে গায়ক বা বাদক বুঝতে পারেন যে তালের আবর্তনের মধ্যে তিনি কোন অংশে আছেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ত্রিতালে একটি খালি; নয় মাত্রায়। যখন এইতালে খালির বিভাগ অর্থাৎ 'না তিন তিন না' বর্ণগুলি বাজে তখন শিল্পী বুঝতে পারেন যে এরপর অর্থাৎ আরও চার মাত্রার পরে তালের আবর্তন শেষ হবে এবং তাকে সমে আসতে হবে, সুতরাং খালির প্রারম্ভেই তিনি সতর্ক হয়ে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে খালির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়নি, তাই কর্ণাটকী তালগুলিতে সবই তালি, খালি নেই। রবীন্দ্রনাথও তালে খালির প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন। এই কারণে রাবীন্দ্রিক তালগুলিতেও কোন খালি নেই।

মানবের আবেগ সঞ্চারে তবলার কার্যকারিতা

মানবের প্রবৃত্তির মধ্যে প্রক্ষোভ বা আবেগপ্রবণতা অন্যতম। নানা কারণে আমাদের মধ্যে এই আবেগপ্রবণতা উজ্জীবিত হয়। সংগীত এই আবেগ প্রবণতার জোয়ার ভাঁটায় একটি অন্যতম উপকরণ। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়" (সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা)।

সংগীতের অন্যতম শাখা তাল প্রক্ষোভ বৃদ্ধির সহায়ক এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তবলার দ্বারা এই তালকার্যই সাধিত হয়। গীত, বাদ্যে বা নৃত্যে তবলার সীমিত সুষম প্রয়োগ শ্রোতার মনে আবেগের কল্লোল এনে দেয় এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তো সংগীতানুষ্ঠানগুলিতে দেখা যায় যে গীত, বাদ্য বা নৃত্যে তবলা সহযোগিতা উচ্চমানের না হলে সেই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের হৃদয়ে দোলা দিতে পারে না; অর্থাৎ শ্রোতার মধ্যে উদ্দীপন ভাবের অভাব ঘটে।

আমাদের সুখাবেগ বা দুঃখাবেগজাতীয় হৃদয়ের যে কোনও অনুভাবেরই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাবার ব্যাপারে যে সংগীত জড়িত, সেই সংগীতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে অবনদ্ধ বাদ্য তবলার একটি অন্যতম ভূমিকা আছে।

তবলা বাদন পদ্ধতি

যে কোনও লক্ষ্যে পৌছতে গেলে একটি সুনির্দিষ্ট পথে চলতে হয়। কারণ কোনও প্রকারে পথভ্রষ্ট হলে আর লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয় না। যেমন সংগীত শিক্ষা করতে গেলে প্রথমে স্বরজ্ঞান করতে হয়, নচেৎ সংগীত জীবনের সমগ্র ভিৎটাই হয়ে যায় দুর্বল। কেবলমাত্র সংগীত নয়, বাদ্য বা নৃত্যানুশীলনকারীকেও একটি নিদিষ্ট পদ্ধতির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয় এবং বলা বাহুল্য যে তবলা বাদনও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবলা বাদনে প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষার্থীকে তবলার বর্ণ বা বোল গুলিকে স্পষ্টীকরণের দিকে মনোযোগ দিতে হয় এবং এই কাজে প্রয়োজন প্রথমতঃ সঠিকভাবে উপবেশনের এবং দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে অঙ্গুলী চালনার। এই দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই তবলা বাদন পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে।

তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে তবলাবাদন পদ্ধতির কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ঘরাণা বিশেষে কিংবা ব্যক্তি বিশেষে এর হেরফের ঘটে থাকে। আমাদের দেশে এখনও সংগীতকে Standardise করে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভাবে শিক্ষা দেবার সুব্যবস্থা হয়নি। পাশ্চাত্য সংগীতবেত্তারা এই বিষয়ে আমাদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে সংগীত-শিক্ষক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। এই কারণে বিভিন্ন ঘরাণার তবলা বাদন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার। যেমন দিল্লী বাজে তর্জনী ও মধ্যমার প্রয়োগাধিক্য সহ কিনার বা চাটীতে বোলের কাজ বেশি করা হয়। আবার বেনারস বাজে দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাঁয়ার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ডাহিনার থাপ, লব বা গাবের উপর কাজ বেশি হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ঘরাণায় তবলা বাদনে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। ঘরাণা বিশেষের বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেন। কিন্তু এ সব সত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে তবলা বাদনকে আরও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করতে গেলে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করাই ভাল

দ্বাদশ অধ্যায়

তাল

তাল অংকে ৪৫টি তালের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তালগুলির দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আড়, কুআড় এবং বিআড় লয়ে লিখবার পদ্ধতিও দেখান হল। সকল তালেরই লয়কারী দেওয়া হল না এই কারণে যে, এইগুলি লিখবার গাণিতিক পদ্ধতি সহজভাবে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং ওই নিয়মের সাহায্যে যে কোনও তালের যে কোনও লয়কারী লেখা যাবে।

সমান মাত্রাসংখ্যাসম্পন্ন একাধিক তালের একটি করে মাত্র তালকে বিভিন্ন লয়কারীতে লিখে দেখান হয়েছে; ঐ একই মাত্রার অন্যান্য তাল-গুলির ক্ষেত্রে লয়কারীর আরম্ভের স্থান বা হিসাব একই প্রকার হবে, কেবলমাত্র প্রয়োজনানুসারে বিভাগ, তালি, খালি এবং বোল পরিবর্তন করতে হবে।

এই অধ্যায়ে যে তালগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে মাত্রা-সংখ্যাসহ প্রথমেই তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

মাত্রা সংখ্যা **তালের নাম**

৬ ....(১) দাদরা।

৭···(২) তীব্রা (তেওরা), (৩) রূপক, (৪) পোস্তা বা পোস্ত্।

৮...(৫) কাহারবা, (৬) আদ্ধা, (৭) ধুমালী, (৮) ঠুংরী, (৯) কাওয়ালী।

৯.........................(১০) বসন্ত।

১০···(১১) ঝাঁপতাল, (১২) সুলতাল (সুরফাঁক তাল), (১৩) ঝম্পা।

১১.. (১৪) রুদ্র, (১৫) মণি, (১৬) কুম্ভ।

মাত্রা সংখ্যা **তালের নাম**

১২··(১৭) একতাল, (১৮) চৌতাল, (১৯) খেম্‌টা, (২০) আড়খেমটা, (২১) বিক্রম।

১৪···(২২) ঝুমরা, (২৩) আড়াচৌতাল, (২৪) ধামার, (২৫) ফরোদস্ত, (২৬) দীপচন্দী।

১৫···(২৭) পঞ্চম সওয়ারী, (২৮) গজঝম্প, (২৯) যতিশেখর, (৩০) চিত্রা।

১৬···(৩১) ত্রিতাল, (৩২) তিলয়াড়া (৩৩) পাঞ্জাবী, (৩৪) আড়াঠেকা, (৩৫) টপ্পা, (৩৬) যৎ, (৩৭) বসারী সওয়ারী, (৩৮) অথমঞ্জরী সওয়ারী।

১৭···(৩৯) শিখর, (৪০) ঝুম্বি।

১৮···(৪১) মত্ত, (৪২) লক্ষ্মী।

১৯···(৪৩) কৈদ ফরোদস্ত।

২১···(৪৪) গণেশ তাল।

২৮···(৪৫) ব্রহ্মতাল।

(১) দাদ্‌রা

মাত্রা সংখ্যা—৬। বিভাগ—২। প্রতি বিভাগে তিনটি মাত্রা। একটি তালি ও একটি খালি। ১ম মাত্রায় তালি এবং ৪র্থ মাত্রায় খালি।

	১	২	৩		৪	৫	৬
ঠেকাঃ	ধা	ধিন্	না	।	না	তিন্	না
	×				০		

॥ দুইগুণ (৪ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধিন্	না	।	ধা ধিন্	নানা	তিন্‌না	।	ধা
×				০				×

॥ তিনগুণ (৫ মাত্রা থেকে) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬		১
ধা	ধিন্	না	।	না	ধাধিন্‌না	নাতিন্‌না	।	ধা
×				০				×

॥ চারগুণ (৪ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ১
ধা ধিন্ না | না ssধাধিন্ নানাতিন্না | ধা
× | ০ | ×

॥ আড়লয় (৩ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ১
ধা ধিন্ ধাsধিন | sনাs নাsতিন্ sনাs | ধা
× | ০ | ×

(২) তীব্রা বা তেওরা

মাত্রা সংখ্যা—৭ এবং বিভাগ তিনটি। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে ৪ মাত্রা (৩ ২।২)। তিনটি বিভাগে ৩টিই তালি, ফাঁক নেই।

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭
ঠেকা : ধি ধি না | ধি না | ধি নানা
× | ২ | ৩

পাখোয়াজের ঠেকা : ধা ঘেনে নাগ | গদ্ দী | ঘেনে নাগ
× | ২ | ৩

॥ দুইগুণ (৩ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ধি না | sধি ধিনা | ধিনা ধিনানা | ধি
× | ২ | ৩ | ×

॥ তিনগুণ (৪ঊ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ধি না | ধি ssধি | ধিনাধি নাধিনানা | ধি
× | ২ | ৩ | ×

॥ চারগুণ (৫½ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ধি না | ধি না | ১ধিধিনা ধিনাধিনানা | ধি
× | ২ | ৩ | ×

॥ আড়লয় (২⅓ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ধি ১ধি১ | ধি১না ১ধি১ | না১ধি ১না না১ | ধি
× | ২ | ৩ | ×

॥ কুআড়লয় (১৩/৫ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ১১ধি১১ ১ধি১১১ | না১১১ধি ১১১না১ | ১১ধি১১ ১নানা১১১ | ধি
× | ২ | ৩ | ×

॥ বিআড়লয় (৪ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ | ১
ধি ধি না | ধি১১১ধি১১ ১না১১১ধি | ১১না১১১ধি ১১১নানা১১১ | ধি
× | ২ | ৩ | ×

(৩) রূপক

রূপক তালের মাত্রাসংখ্যা এবং বিভাগ পূর্ববর্তী তেওরা তালের অনুরূপ। তবে এর ১ম মাত্রায় 'সম্' এর পরিবর্তে ফাঁকের চিহ্ন দেওয়া হয় এবং পরবর্তী ২টি বিভাগে ২টি তালি। ১ম মাত্রায় ফাঁকের চিহ্ন থাকলেও একে সম্ এর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রূপকের গতি সমপ্রকৃতিক তাল তেওরা অপেক্ষা শ্লথ।

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭
ঠেকা : তি তি না | ধিন ধিন | ধাগে তেরেকেটে
০ | ১ | ২

পাখোয়াজের ঠেকা : তাগ দিৎ তা | তাগ তেটে | গদি ঘেনে
০ | ১ | ২

(৪) পোস্তা বা পোস্ত

মাত্রা সংখ্যা—৭। বিভাগ ৩টি। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা এবং ২য় এবং ৩য় বিভাগে ২টি করে ৪টি মাত্রা। ৩টি তালি (১; ৪ ও ৬ মাত্রায়), খালি নেই। অনেকে আবার ৩,৪ করে ২টি বিভাগ দেখান এবং এই ২টি বিভাগে ২টিই তালি। মতান্তরে মাত্রাসংখ্যা পাঁচ এবং ৩।২ করে ২টি বিভাগ।

```
        ১  ২  ৩      ৪  ৫      ৬  ৭
ঠেকা :  তিন ঽ তাক ।  ধিন্ ঽ  |   ধা গে
        ×            ২          ৩
```

রূপক ও পোস্ত তালের দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আড়, কুআড় এবং বিআড় লয় তেওরা তালের হিসাবানুযায়ী লিখতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকার বোল ও তালচিহ্নের পরিবর্তন করতে হবে।

(৫) কাহারবা

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—২টি। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা। ১টি তালি ও ১টি খালি। ১ম মাত্রায় তালি, ৫ম মাত্রায় খালি।

```
        ১  ২  ৩  ৪      ৫  ৬  ৭  ৮
ঠেকা :  ধা গে না তি  |  না ক  ধি  না
        ×               ০
```

॥ দুইগুণ (৫ মাত্রার পর থেকে) ॥

```
১  ২  ৩  ৪     ৫    ৬    ৭    ৮      ১
ধা গে না তি |  ধাগে নাতি নাক ধিনা |  ধা
×              ০                     ×
```

॥ তিনগুণ (৫৳ মাত্রার পর থেকে) ॥

```
১  ২  ৩  ৪     ৫   ৬     ৭     ৮       ১
ধা গে না তি |  না ঽধাগে নাতিনা কধিনা |  ধা
×              ০                       ×
```

॥ চারগুণ (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১
ধা গে না তি | না ক ধাগেনাতি নাকধিনা | ধা
× ০ ×

॥ আড়লয় (২½ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১
ধা গে ঽঽধা ঽগেঽ | নাঽতি ঽনাঽ কঽধি ঽনাঽ | ধা
× ০ ×

(৬) আদ্ধা

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)। সেতারখানি আদ্ধা তালের মাত্রা সংখ্যা ১৬ এবং বিভাগ ৪টি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকাঃ ধাধিন্ ঽধা | ধাধিন্ ঽধা | তাতিন্ ঽতা | ধাধিন্ ঽধা
× ২ ০ ৩

(৭) ধুমালী

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়), ১টি খালি (৫ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকাঃ ধা ধিন্ | ধা তিন্ | না ধিন্ | ধাগে ত্রেকেটে

(৮) ঠুংরী

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়), ১টি খালি (৫ মাত্রায়)। মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা—১৬ এবং বিভাগ—৪টি। ঠুংরী তালকে অনেকে ধুমালী

বলে থাকেন এবং মতান্তরে এর ৪।৪ করে ২টি বিভাগ। এই দুইটি বিভাগে ১টি তালি ও ১টি ফাঁক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা: ধিন্ ধা । গে ধিন্ । তিন্ ধা । গে তিন্
× ২ ০ ৩

(৯) কাওয়ালী

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—২টি। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা। ২টি তালি (১ ও ৫ মাত্রায়), খালি নেই। মতান্তরে ১টি তালি ও ১টি খালি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা: ধা ধিন্ ধাধা ধিন্ । তা তিন্ ধা তেরেকেটে
× ২

আদ্ধা, খেমটা, ঠুংরী এবং কাওয়ালী তালের দুইগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়লয় ইত্যাদি উপরি উক্ত কাহারবা তালের হিসাবানুযায়ী লিখতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকার বোল, তালচিহ্ন এবং বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

(১০) বসন্ত

মাত্রাসংখ্যা—৯ এবং বিভাগও নয়টি। প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা। ৬টি তালি (১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ মাত্রায়) এবং তিনটি খালি (৫, ৭ ও ৯ মাত্রায়)। মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা ১৮, বিভাগ ৬টি (২।২।২।৪।৪।৪) এবং তালিও ৬টি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ঠেকা: ধা । দেৎ । দেৎ । থুন্ । না । তেটে । কতা । গদি । গন
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ০

। ঠেকা (মতান্তরে)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
ধু ম । কি ট । ধু ম । কি ট ত ক । ধু ম কি ট । ত ক ধা তা
× ২'০ ৩ ৪ ৫ ৬

॥ দুইগুণ (৪ঠে মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা | দেৎ | দেৎ | থুন্ | ঽধা | দেৎ দেৎ | থুননা | তেটেকতা |
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬

৯ ১
গদিগন | ধা
০ ×

॥ তিনগুণ (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা | দেৎ | দেৎ | থুন্ | না | তেটে | ধাদেৎদেৎ | থুন্না তেটে |
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬

৯ ১
কতাগদিগন | ধা
০ ×

॥ চারগুণ (৬ষ্ঠ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা | দেৎ | দেৎ | থুন্ | না | তেটে | ঽ ঽ ঽ ধা | দেৎ দেৎ থুন্ না |
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬

৯ ১
তেটেকতাগদিগন | ধা
০ ×

॥ আড়লয় (৪ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধা | দেৎ | দেৎ | ধা ঽ দেৎ | ঽ দেৎ ঽ | থুন্ ঽ না | ঽ তেটে |
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০

৮ ৯ ১
কতা গ | দি গ ন | ধা
৬ ০ ×

॥ কুআড়লয় (১¼ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫
ধা | ঽঽঽঽ ধা | ঽঽঽ দেৎ | ঽঽ দেৎ ঽঽ | ঽ থুন্ ঽঽঽ
× ২ ৩ ৪ ০

৬ ৭ ৮ ৯ ১
না ঽঽঽ তে | ঽ টে ঽ ক ঽ | তা ঽ গ ঽ দি | ঽ গ ঽ ন ঽ | ধা
৫ ০ ৬ ০ ×

॥ বিআড় লয় (৩¾ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫
ধা | দেৎ | দেৎ | ঽঽঽঽঽঽ ধা | ঽঽঽ দেৎ ঽঽঽ
× ২ ৩ ৪ ০

৬ ৭ ৮
দেৎ ঽঽঽ থুন্ ঽঽ | ঽ না ঽঽঽ তে ঽ | টে ঽ ক ঽঽ তা ঽ গ |
৫ ০ ৬

৯ ১
ঽ দি ঽ গ ঽ ন ঽ | ধা
০ ×

(১১) ঝাঁপতাল

মাত্রাসংখ্যা—১০। বিভাগ—৪টি। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা, অর্থাৎ ২।৩।২।৩ হিসাবে চারটি বিভাগ করা হয়েছে। তিনটি তালি (১, ৩ এবং ৮ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৬ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা: ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না
× ২ ০ ৩

॥ দুইগুণ (৬ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১
ধি না | ধি ধি না | ধিনা ধিধি | নাতি নাধি ধিনা | ধি
× ২ ০ ৩ ×

॥ তিনগুণ (৬৩ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১
ধি না | ধি ধি না | তি ssধি | নাধিধি নাতিনা ধিধিনা | ধি
× ২ ০ ৩ ×

॥ চারগুণ (৭২ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১
ধি না | ধি ধি না | তি না | ssধিনা ধিধিনাতি নাধিধিনা | ধি
× ২ ০ ৩ ×

॥ আড়লয় (৩৩ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১
ধি না | ধি sধিs নাsধি | sধিs 'নাsতি | sনাs ধিsধি sনাs | ধি
× ২ ০ ৩ ×

॥ কুআড় লয় (৩ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধি না | ধিsss নাsssধিs ssধিss | sনাsss তিssssনা |
× ২ . ০

৮ ৯ ১০ ১
sssধিs ssধিs sনাsss | ধি
৩ ×

॥ বিআড় লয় (৪২ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধি না | ধি ধি ssধিsssনা | sssধিsss ধিssssনা |
× ২ ০

৮ ৯ ১০ ১
sতিssনা sssধিsssধি sssনাsss | ধি
৩ ×

(১২) সুলতাল বা সুরফাঁকতাল

মাত্রাসংখ্যা –১০। বিভাগ—৫। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা।

৩টি তালি (১, ৫, ৭ মাত্রায়) এবং ২টি খালি (৩ ও ৯ মাত্রায়)। মতান্তরে ৪।২।৪ করে তিনটি বিভাগ এবং এই তিনটি বিভাগে ৩টিই তালি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা : ধা ধা | দিন্ তা | কিট ধা | তিট কত | গদি গন
× ০ ২ ৩ ০

॥ পাখোয়াজের ঠেকা ॥

ধা ঘেনে | নাগ্ দি | ঘেনে নাগ | গদ্ দি | ঘেনে নাগ্
× ০ ২ ৩ ০

(১৩) ঝম্পা

মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঝাঁপতালের মত ২।৩।২।৩ ছন্দ। ৩টি তালি (১, ৩, ৮ মাত্রায়) এবং ১টি খালি বা ফাঁক (৫ মাত্রায়)। মতান্তরে ৪টি বিভাগের ১ম বিভাগে ৫টি, ২য় এবং ৪র্থ বিভাগে ২টি করে এবং ৩য় বিভাগে ১টি মাত্রা। আবার ৩।৩।৫ বিভাগও দেখা যায়। তাছাড়া ৬, ৭, ৮ এবং ১২ মাত্রায় ঝম্পা তালের উল্লেখও পাওয়া যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা : ধিন্ ঽ | ধা গে তিন্ | তিট ধা | তিট কত গদি
× ২ ০ ৩

ঝম্পাতালের দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুআড়, এবং বিআড় লয় অবিকল ঝাঁপতালের হিসাবানুযায়ী দেখাতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকা'র বোলের পরিবর্তন হবে এবং মূলতালের লয়কারীতে বোল এবং বিভাগ উভয়ই পরিবর্তিত হবে।

(১৪) রুদ্রতাল

মাত্রাসংখ্যা—১১। বিভাগ—১১। প্রতি বিভাগে ১টি করে

মাত্রা। ৮টি তালি (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ মাত্রায়) এবং ৩টি খালি (৩, ৭, ১১ মাত্রায়)। মতান্তরে ২।১।১।২।১।১।১।২ করে মোট ৮টি বিভাগ মানা হয় এবং এই ৮টি বিভাগে ৮টি তালি, খালি নেই। তাছাড়া ১৫, ১৬ এবং ১৭ মাত্রার রুদ্র তালেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এর কোনটিতেই ফাঁক নেই।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ঠেকা:	ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক	ত্তা	ধি	না
	×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০

॥ দুইগুণ (৫½ মাত্রা হতে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধি	না	ধি	না	তা	ঽধি	নাধি	নাতা	তিনা	কত্তা	ধিনা	ধি
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০	×

॥ তিনগুণ (৭⅓ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ঽধিনা	ধিনাতা	তিনাক	ত্তাধিনা	ধি
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০	×

॥ চারগুণ (৮¼ মাত্রা হতে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক	ঽধিনাধি	নাতাতিনা	কত্তাধিনা	ধি
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০	×

আড়লয় (৩$\frac{২}{৩}$ মাত্রা হতে)॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধি | না | ধি | ssধি | sনাs | ধিsনা | sতাs | তিsনা

৯ ১০ ১১ ১

sকs | তাsধি | sনাs | ধি

৭ ৮ ০ ×

॥ কুআড়লয় (২$\frac{১}{৫}$ মাত্রা হতে)॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধি | না | sধিsss | নাsssধি | sssনাs | ssতাs | sতিsss

× ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০

৮ ৯ ১০ ১১ ১

নাsssক | sssতাs | ssধিss | sনাsss | ধি

৬ ৭ ৮ ০ ×

॥ বিআড়লয় (৪$\frac{২}{৭}$ মাত্রা হতে)॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ধি | না | ধি | না | ssssssধি | ssনাsssধি | sssনাsss |

× ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০

৮ ৯ ১০ ১১ ১

তাsssতিss | sনাsssকs | ssতাধিss | sssনাsss | ধি

৬ ৭ ৮ ০ ×

(১৫) মণিতাল

মাত্রাসংখ্যা—১১। বিভাগ—৪। ১ম, ৩য় ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা এবং ২য় বিভাগে ২টি মাত্রা (৩,২,৩।৩)। ৪টি তালি, খালি বা ফাঁক নেই।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

ঠেকা: ধা ধি ট | কি ট | ধা কি ট | তা কি ট

× ২ ৩ ৪

(১৬) কুম্ভতাল

মাত্রা সংখ্যা—১১। বিভাগ—১১। প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা। ৮টি তালি (১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ মাত্রায়) এবং ৩টি ফাঁক বা খালি (২, ৬ ও ১১ মাত্রায়)। মতান্তরে ৭টি তালি (১, ৩, ৪; ৬, ৮, ৯ ও ১০ মাত্রায়) এবং ৪টি খালি (২, ৫, ৭ এবং ১১ মাত্রায়)।

	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১
ঠেকাঃ	ধি	।	না	।	তেটে	।	কত	।	ধি	।	না	।	তাক	।	তেটে	।	কত	।	গদি	।	গন
	×		০		২		৩		৪		০		৫		৬		৭		৮		০

রুদ্র, মণি এবং কুম্ভ—এই তিনটি তালেরই মাত্রা সংখ্যা—১১। রুদ্র এবং কুম্ভ তালের বিভাগ একই প্রকার, কেবলমাত্র মণিতালের বিভাগ অন্যপ্রকার। কুম্ভ তালের যাবতীয় লয়কারী, বিভাগ ইত্যাদি রুদ্রতালের অনুরূপ হবে, কেবলমাত্র বোলগুলি পৃথক হবে; মণিতালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লয়ের হিসাব রুদ্রতালের মত হলেও বোল এবং বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

(১৭) একতাল

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৬। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি খালি বা ফাঁক (৩ ও ৭ মাত্রায়)। মতান্তরে ত্রিমাত্রিক ছন্দের চতুর্বিভাগীয় (৩।৩।৩।৩) একতালের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই চারটি বিভাগে ৩টি তালি এবং ১টি খালি।

	১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮
ঠেকাঃ	ধিন্	ধিন্	।	ধাগে	তেরেকেটে	।	থুন্	না	।	কৎ	তা
	×			০			২			০	

৯	১০		১১	১২
ধাগে	তেরেকেটে	।	ধিন্	না
৩			৪	

॥ ত্রিমাত্রিক ছন্দের ঠেকা ॥

ধা	ধিন্	ধা	।	ধাগে	তিন্	না	।	কৎ	তেটে	ধিন্	।	তেটে	ধিন্	তেটে
×				০				২				৩		

॥ দুইগুণ (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধিন্ ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে | থুন্ না | ধিন্‌ধিন্ ধাগেতেরেকেটে |
× ০ ২ ০

৯ ১০ ১১ ১২ ১
থুন্‌না কৎতা | ধাগেতেরেকেটে ধিন্‌না | ধিন্
৩ ৪ ×

॥ তিনগুণ (৯ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধিন্ ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে | থুন না | কৎ তা |
× ০ ২ ০

৯ ১০ ১১ ১২ ১
ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটেথুন্‌না | কৎতা ধাগে তেরেকেটে ধিন্‌না | ধিন্
৩ ৪ ×

॥ চারগুণ (১০ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধিন্ ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে | থুন্ না | কৎ তা |
× ০ ২ ০

৯ ১০ ১১ ১২
ধাগে ধিন্‌ধিন্ ধাগেতেরেকেটে | থুন্‌নাকৎতা ধাগেতেরেকেটে ধিননা |
৩ ৪

১
ধিন
×

॥ আড়লয় (৫ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ধিন্ ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে | ধিন্‌ঽধিন্‌ঽ ধাগে |
× ০ ২

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১
তেরেকেটে ধুন্ ঃনাঃ | কৎঃতা ঃধাগে ¦ তেরেকেটে ধিন্ ঃনাঃ | ধিন
০ ৩ ৪ ×

॥ কুআড়লয় (২$\frac{১}{৪}$ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ধিন্ ধিন্ | ঃঃধিন্ঃঃ ঃধিন্ঃঃঃ | ধাঃগেঃতে রেকেটেধুন্ঃ |
× ০ ২

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ঃঃনাঃঃ ঃকৎঃঃ | তাঃঃঃধা ঃগেঃতেরে কেটেধিন্ঃঃঃ ঃনাঃঃঃ |
০ ৩ ৪

১
ধিন্
×

॥ বিআড়লয় (৫$\frac{১}{২}$ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ধিন্ ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে | ধুন্ ঃধিন্ঃঃঃধিন্ |
× ০ ২

৭ ৮ ৯ ১০
ঃঃধাগেঃতে রেকেটেধুন্ঃঃ | নাঃঃঃকৎঃঃ ঃতাঃঃঃধাঃ |
০ ৩

১১ ১২ ১
গেঃতেরেকেটেধিন্ ঃঃঃনাঃঃঃ | ধিন
৪ ×

(১৮) চৌতাল

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৬। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৫, ৯, ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি খালি বা ফাঁক (৩ ও ৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দিন্	তা	কিট	ধা	দিন্	তা	তিট	কত	গদি	গন

(১৯) খেম্‌টা

মাত্রাসংখ্যা—১২। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৩টি করে মাত্রা (৩।৩।৩।৩)। ৩টি তালি (১, ৪, ও ১০ মাত্রায়) এবং ১টি খালি বা ফাঁক (৭ মাত্রায়)। মতান্তরে ৯ মাত্রার খেম্‌টারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঠেকা:	ধা	তে	টে	ধা	ধি	না	তা	তে	টে	না	ধি	না
	×			২			০			৩		

(২০) আড়খেম্‌টা

মাত্রাসংখ্যা, বিভাগ, তালি ও খালি উপযুক্ত খেমটা তালের অনুরূপ। এই তালটি খেমটার আড় বলে একে আড়খেম্‌টা বলা হয়; অর্থাৎ খেম্‌টার মত চার-এর ছন্দে প্রধান না পড়ে আড়খেম্‌টা তালে প্রধান থাকে ৩য় মাত্রার বাণীতে। তাছাড়া খেম্‌টা তাল অপেক্ষা আড়খেমটা বিলম্বিত লয়ে প্রযোজ্য।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঠেকা:	ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধা	ধা	তিন	তা	তেরেকেটে	ধিন	ধা	ধা	ধিন্
	×			২			০			৩		

(২১) বিক্রম

মাত্রাসংখ্যা—১২। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ২টি, ২য় ও ৩য়

বিভাগে ৩টি করে এবং ৪র্থ বিভাগে ৪টি মাত্রা (২ । ৩ । ৩ । ৪)। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৯ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৬ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ১ খি তা ১ | ক ১ তা | তিট কত গদি গন |
× ২ ০ ৩

চৌতাল, খেম্‌টা, আড়খেমটা এবং বিক্রম তালের লয়কারী একতালের অনুরূপ হবে। খেম্‌টা এবং বিক্রম তালের বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

(২২) ঝুম্‌রা

মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগ ৪টি করে মাত্রা (৩ । ৪ । ৩ । ৪)। ৩টি তালি (১, ৪ ও ১১ মাত্রায়), ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়।

॥ ঠেকা (১ম প্রকার) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন ১ধা তেরেকেটে | ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
তিন্ ১তা তেরেকেটে | ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে
০ ৩

॥ ঠেকা (২য় প্রকার) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তিন তা |
× ২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪
ধিন ধিন্ ধাগে তেরেকেটে
৩

॥ দুইগুণ (৮ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে | ধিন্‌ধিন্ ধাধিন ধিন্‌ধাগে
× ২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১
তেরেকেটেতিন্ তিন্‌তা ধিন্‌ধিন্ ধাগেতেরেকেটে | ধিন্
৩ ×

॥ তিনগুণ (৯ই মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে | তিন্ তিন্ ঽধিন্‌ধিন্
× ২ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১
ধাধিন্‌ধিন্ ধাগেতেরেকেটেতিন তিনতাধিন ধিন্‌ধাগেতেরেকেটে | ধিন্
৩ ×

॥ চারগুণ (১০ই মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধিন ধিন ধা | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তিন তা | ঽঽধিনধিন
× ২ ০ ৩

১২ ১৩ ১৪ ১
ধাধিন্‌ধিন্‌ধাগে তেরেকেটেতিন্‌তিন্‌তা ধিন্‌ধিন্‌ধাগেতেরেকেটে | ধিন্
×

॥ আড়লয় (৪ই মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ঽঽধিন্ ঽধিনঽ ধাঽধিন | ঽধিনধাগে ঽতেরেকেটে
× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১
ঽতিনঽ | তিনঽতা ঽধিনঽ ধিনঽধাগে ঽতেরেকেটে | ধিন্
৩ ×

॥ কুআড়লয় (২¼ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন্ ধিন্ ssধিন্ | ssধিন্ss | sধাsss ধিন্sssধিন্ sssধাs |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২
গেsতেরেকেটে ssতিন্s ssতিন্ss | তাsssধিন্ sssধিন্s
● ৩

১৩ ১৪ ১
ssধাsগে sতেরেকেটে | ধিন্
×

॥ বিআড় লয় (৭ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ধিন ধাগে ধিন্sssধিন্ss | sধাsssধিন্s ssধিনssধা
× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩
sগেsতেরেকেটে | তিন্sssতিন্ss sতাsssধিন্s ssধিন্sssধা
৩

১৪ ১
sগেsতেরেকেটে | ধিন্
×

(২৩) আড়াচৌতাল

মাত্রা সংখ্যা—১৪। বিভাগ - ৭। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৩, ৭ ও ১১ মাত্রায়) এবং ৩টি ফাঁক (৫, ৯, ও ১৩ মাত্রায়) মতান্তরে ২।৪।৪।৪ করে চারটি বিভাগ এবং এই চারটি বিভাগে চারটিই তালি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা ঃ ধিন্ তেরেকেটে | ধি না | তু না | ক তা | ধি ধি |
× ২ ০ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪
না ধি | ধি না
৪ ০

। পাখোয়াজের ঠেকা ।

ধা গে	ধা গে	দিন্ তা	কৎ তাগে
×	২	০	৩
দিন্ তা	তেটে কতা	গদি ঘেনে	
০	৪	০	

(২৪) ধামার

মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৫ মাত্রা, ২য় বিভাগে ২ মাত্রা, ৩য় বিভাগে ৩ মাত্রা এবং ৪র্থ বিভাগে চার মাত্রা (৫ । ২ । ৩ ৪)। ৩টি তালি (১, ৬ ও ১১ মাত্রায়) এবং ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়)। মতান্তরে তিনটি বিভাগ (৫।৫।৪), তিনটি তালি, অথবা ৫টি বিভাগ (৩।২।২ ৩।৪); ১ম, ৩য় এবং ৫ম বিভাগে তালি ২য় ও ৪র্থ বিভাগে থালি।

	১	২	৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০		১১	১২	১৩	১৪
ঠেকাঃ	ক	ধি	ট	ধি	ট	।	ধা	ऽ	।	গ	দি	ন্	।	দি	ন	তা	ऽ
	×						২			০				৩			

(২৫) ব্রহ্মতাল

মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৭। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা ৫টি তালি (১, ৫, ৭, ৯ ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি ফাঁক (৩ ও ১৩ মাত্রায়)। মতান্তরে ১, ৫, ৯, ১১ ও ১৩ মাত্রায় তালি এবং ৩য় ও ৭ম মাত্রায় খালি।

অন্যমতে বিভাগ ৫টি। ১ম ও ২য় বিভাগে ৪টি এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা (৪।৪।২।২।২)। এই পাঁচটি বিভাগে ৫টিই তালি (১, ৫, ৯, ১১ এবং ১৩ মাত্রায়)। ফাঁক নেই।

	১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮		৯	১০
ঠেকাঃ	ধিন	ধিন্	।	ধাগে	তেরেকেটে	।	থুন্	না	।	কৎ	তা	।	ধিন্	কতা
	×			০			২			৩			৪	

১১	১২		১৩	১৪
তেরেকেটে	ধিনা	।	কধি	নাক্
৫			০	

(২৬) দীপচন্দী

মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩।৪।৩।৪)। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি তালি (১, ৪ ও ১১ মাত্রায়) এবং ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়)। এই তালকে অনেকে 'চাঁচর' নামেও অভিহিত করেন।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা ধিন ऽ | ধা গে তিন ऽ | তা তিন ऽ | ধা ধা ধিন ऽ

× ২ ০ ৩

ঝুম্‌রা তালের হিসাব মতই আড়াচৌতাল, ধামার, ফরোদস্ত এবং দীপচন্দী তালের লয়কারী লিখতে হবে।

(২৭) পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী

মাত্রা সংখ্যা—১৫। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩।৪।৪।৪)। ৩টি তালি (১. ৪ ও ১২ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৮ মাত্রায়)। মতান্তরে ৪টি বিভাগ (৪।৪।৪।৩), ৪টি তালি। আবার নিম্নলিখিত ছন্দের পঞ্চম সওয়ারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়:

৪ | ৪ | ৪ | ১½ | ১½

× ২ ৩ ৪ ৫

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ঠেকা: ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা

× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

তেরেকেটে তুনা | কৎতা ধিধি নাধি ধিনা

৩

ঠেকা (মতান্তরে): ধা ऽ ধা দিন | তা কৎ ধু ম | কি ট ত ক |

× ২ ৩

ধা দিন্ তাকে

৪

॥ দুইগুণ (৭২/১ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা |
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ऽধিন তেরেকেটেধিনা কৎধিধি নাধিধিনা | তিন্‌তিনা তেরেকেটেতুনা
০ ৩

১৪ ১৫ ১
কৎতাধিধি নাধিধিনা | ধিন
×

॥ তিনগুণ (১১ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা
× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩
তেরেকেটে ধিনতেরেকেটেধিনা | কৎধিধিনাধি ধিনাতিনতিনা
৩

১৪ ১৫ ১
তেরেকেটেতুনাকৎতা ধিধিনাধিধিনা | ধিন
×

॥ চারগুণ (১১২/১ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা
× ২ ০

১০ ১১ ১২ ১৩
তেরেকেটে তুনা | ऽধিনতেরেকেটেধিনা কৎধিধিনাধিধিনা
৩

১৪ ১৫ ১
তিনতিনাতেরেকেটেতুনা কৎতাধিধিনাধিধিনা | ধিন
×

॥ আড়লয় (৬ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি ধিনsতেরেকেটে sধিনা
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২
কৎsধিধি sনাধিs ধিনাsতিন sতিনাs | তেরেকেটেতুনা
০ ৩

১৩ ১৪ ১৫ ১
sকৎতাs ধিধিsনাধি sধিনাs | ধিন
×

॥ কুআড়লয় (৪ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন তেরেকেটে ধিনা | ধিনsss তেরেকেটেs ধিsনাsকৎ ssধিধিss
× ২

৮ ৯ ১০ ১১ ১২
নাsধিsধি sনাsতিনs ssতিsনা sতেরেকেটে | তুsনাsকৎ
০ ৩

১৩ ১৪ ১৫ ১
sতাsধিs ধিsনাsধি sধিsনাs | ধিন
×

॥ বিআড় লয় (৬ষ্ঠ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ssধিনাsss
× ২

৮ ৯ ১০ ১১
তেরেকেটেধিsনা sকৎsssধি ধিsনাsধিsধি sনাsতিনss |
০

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১
তিsনাsতেরেকে টেতুsনাsকৎs তাধিsধিনা sধিsধিsনাs | ধিন

(২৮) গজঝম্পা

মাত্রাসংখ্যা—১৫। বিভাগ—৪টি। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা এবং ৩য় বিভাগে ৩টি মাত্রা (৪।৪।৩।৪)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা: ধা ধিন নক্ তক্ | ধা ধিন নক্ তক্
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধিন নক্ তক্ | তিট কত গদি গন
০ ৩

(২৯) যতিশেখর

মাত্রাসংখ্যা—১৫। বিভাগ—১০টি। ১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম বিভাগে ১টি করে মাত্রা এবং ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা (১।২ ২।১।১।২।১।১।২।২) ১০টি তালি, খালি নেই। মতান্তরে ১০টি বিভাগ নিম্নোক্তরূপ:—

১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ঠেকা: ধা | কৎ ধিন | না তেটে | ধি | ধি | না তেটে | ধাগি | নেধা
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১২ ১৩ ১৪ ১৫
তেরেকেটে ধিনা | গদি গন
৯ ১০

ঠেকা (মতান্তরে): ধা | তেৎ ধিন | না ত্রক্। ধিন | ধিন | না তেৎ |
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধাগে | নধা | ত্রক্ | ধিনা গদি ঘেনে
৭ ৮ ৯ ১০

(৩০) চিত্রা

মাত্রাসংখ্যা—১৫। বিভাগ—৫। ১ম ও ৫ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা, ২য় বিভাগে ৩টি ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (২। ৩। ৪। ৪। ২)। ৩টি তালি (১, ৩, এবং ১০ মাত্রায়) এবং ২টি খালি (৬ ও ১৪ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ঠেকাঃ ধি না | ধি ধি না | থুন না কৎ তা | তেরেকেটে ধি না
× ২ ০ ৩

১৩ ১৪ ১৫
ধি | ধি না
০

গজঝম্পা, যতিশেখর এবং চিত্রা তালের লয়কারী পঞ্চম বা ছোট সওয়ারীর হিসাবানুযায়ী করতে হবে, কেবলমাত্র বোল, বিভাগ ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হবে।

(৩১) ত্রিতাল

মাত্রাসংখ্যা—১৬। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৪।৪।৪।৪)। ৩টি তালি (১, ৫, ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ঠেকাঃ ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না |
× ২ ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬
তেটে ধিন ধিন ধা
৩

॥ দুইগুণ (৯ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | ধাধিন ধিনধা ধাধিন ধিনধা
× ২ ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১
নাতিন তিনতা তেটেধিন ধিনধা | ধা
৩ ×

॥ তিনগুণ (১০ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা
× | ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | ১
না তিন ssধা ধিনধিনধা | ধাধিনধিন ধানাতিন তিননাতেটে ধিনধিনধা | ধা
০ | ৩ | ×

॥ চারগুণ (১৩ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা
× | ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫
না তিন তিন না | ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিননা
০ | ৩

১৬ | ১
তেটেধিনধিনধা | ধা
×

॥ আড়লয় (৫ই মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধিন ধা | ধা sধাs ধিনsধিনs sধাs
× | ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | ১
ধাsধিন sধিনs ধাsনা sতিন | তিনsনা sতেটেs ধিনsধিন sধাs | ধা
০ | ৩ | ×

॥ কুআড় লয় (৩ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধিন sধাss | ধিনsssধিন sssধাss ssধাss sধিনsss

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫
ধিনSSSধা SSনাS SSতিনSS SতিনSS | নাSSতেটে SSধিনS SSধিনSS
০ ৩

১৬ ১
Sধাsss | ধা
×

॥ বিআড়লয় (৬ষ্ঠ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন SSSSSSধা SSSধিনSS
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩
ধিনSSSধাSS Sধাsssধিন SSধিনSSSধা SSSনাSSSS | তিনSSSতিনSS
০ ৩

১৪ ১৫ ১৬ ১
Sনাsssতেটে SSধিনSSSধিন SSSধাSS | ধা
×

(৩২) তিলোয়াড়া

তিলোয়াড়া তালের মাত্রাসংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি সবই পূর্বোক্ত ত্রিতাল তালের মত। কেবলমাত্র এই তালের বোল ত্রিতাল হতে পৃথক এবং বিলম্বিত খেয়ালের সঙ্গেই তিলোয়াড়া বাজান হয়। মধ্যলয় কিংবা দ্রুত খেয়ালের সঙ্গে বাজান হয় ত্রিতাল।

॥ ঠেকা—১ম প্রকার ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা তেরেকেটে ধিন ধিন | ধা ধা তিন তিন
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
তা তেরেকেটে ধিন্ ধিন্ | ধা ধা ধিন্ ধিন্
০ ৩

॥ ঠেকা—২য় প্রকার ॥

ধা ঽ,তেরেকেটে ধিন্ ঽ,ধিন্ | ধা ধাগে তিন্ তিন্
×   ২

তা ঽ,তেরেকেটে ধিন্ ঽ,ধিন্ | ধা ধাগে ধিন্ ধিন্
০   ৩

(৩৩) পাঞ্জাবী

এই তালটিরও মাত্রাসংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি ত্রিতালের মত। তবে এর বোল পৃথক এবং গতি আড়লয়ে।

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধা	ঽধি	ঽক	ধা	|	ধা	ঽধি	ঽক	ধা
	×					২			
	৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
	তা	ঽতি	ঽক	তা	|	ধা	ঽধি	ঽক	ধা
	০					৩			

(৩৪) আড়াঠেকা

মাত্রাসংখ্যা, বিভাগ, তালি ও খালি উপর্যুক্ত ত্রিতালের মত। এই তালের বোল বিষম ছন্দানুসারী বলে একে আড়াঠেকা নামে অভিহিত করা হয়। মতান্তরে মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ ৪টি এবং প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ১ম, ২য় এবং ৪র্থ বিভাগে তালি ৩য় বিভাগে খালি।

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধা	—ক্রে	ধিন	ধা	|	ভেৎ	ধা	তিন	তিন
	×					২			
	৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
	তা	—ক্রে	ধিন্	ধা	|	ভেৎ	ধা	ধিন	ধিন
	০					৩			

(৩৫) টপ্পা

ত্রিতালের সঙ্গে বোল ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে টপ্পার মিল আছে। এই তালের বোলও আড়িতে বাজান হয় এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে টপ্পা জাতীয় গানে এই তাল প্রযুক্ত হয়। বর্তমানে টপ্পা তাল প্রায় অপ্রচলিত।' মনে হয় এই টপ্পা তালই বাংলায় আড়াঠেকা নামে পরিচিত।

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধিন	ऽতা	ধিন	তা	|	ধিন্	ऽতা	ধিন্	তা
	০					২			

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
না	ऽऽ	কত	তা	|	ধিন্	ऽতা	ধিন্	তা
০					৩			

(৩৬) খং

ত্রিতাল, তিলোয়াড়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি তালের সঙ্গে খং-এর বোল ব্যতীত অন্য কোনও প্রভেদ নেই। এই তালটি আড়িতে বাজে এবং টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি গানের সঙ্গে এর ঠেকা দেওয়া হয়। মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ ৪টি এবং প্রতি বিভাগ ২টি মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)।

	১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধা	ऽ	ধিন	ऽ	|	ধা	ধা	তিন	ऽ
	×					২			

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
তা	ऽ	তিন	ऽ	|	ধা	ধা	ধিন	ऽ
০					৩			

ঠেকা (মতান্তরে) :	ধা	ধিন্	|	ধাধা	তিন্	|	না	তিন্	|	ধাধা	ধিন্
	×			২			০			৩	

॥ সওয়ারী ॥

সওয়ারী তাল অষ্টাদশ প্রকারের আছে। এর মধ্যে কয়েকটির নাম

তৃতীয় সওয়ারী, চতুর্থ সওয়ারী, পঞ্চম সওয়ারী, ষষ্ঠ সওয়ারী, সপ্তম সওয়ারী, শুদ্ধ সওয়ারী, কয়েদ সওয়ারী, বসারী সওয়ারী, অথমঞ্জরী সওয়ারী ইত্যাদি। এই সকল সওয়ারী তালের মাত্রাসংখ্যা, তালি, খালি ইত্যাদি একপ্রকার নয়। একমাত্র পঞ্চম সওয়ারী ব্যতীত অন্যান্য সওয়ারী তাল অপ্রচলিত। পাঠ্যক্রমে ১৬ মাত্রায় সওয়ারী তাল অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আমরা এখানে ১৬ মাত্রার দুই প্রকার সওয়ারী তালের আলোচনা করব—বসারী সওয়ারী এবং অথমঞ্জরী সওয়ারী। পূর্বে পঞ্চম সওয়ারী (২৭৩২) তালের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

(৩৭) বসারী সওয়ারী

মাত্রা সংখ্যা—১৬। বিভাগ—৮। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৫, ৯ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ৪টি খালি (৩, ৭ ও ১১ ও ১৫ মাত্রায়)।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধিন্	ধা |	ধিন্	ধিন্ |	ধা	ধিন্‌ধিন্ |	ধাধিন্	ধিন্‌ধা
	×		০		২		০	

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
তিন্‌তেরেকেটে	তিন্ |	তিনা	তিনা |	কৎতা	ধিন্‌ধিন্ |	ধাধিন্	ধিননা
৩		০		৪		০	

(৩৮) অথমঞ্জরী সওয়ারী

মাত্রা সংখ্যা এবং বিভাগ বসারী সওয়ারীর মত। তবে এই তালে তালি ৫টি (১, ৩, ৭, ৯ ও ১৩ মাত্রায়) এবং খালি ৩টি (৫, ১১ ও ১৫ মাত্রায়)।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা :	ধা	তেরেকেটে |	ধিন	ধা |	তা	তেরেকেটে |	ধিন	ধা
	×		২		০		৩	

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধাগে	তেরেকেটে |	তিন	না |	ধাগে	তেরেকেটে |	থুন	নানা
৪		০		৫		০	

১৬ মাত্রায় সকল তালেরই দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আড়, কুআড় ও বিআড় ত্রিতালের মতো হবে। কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে বোল, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি পরিবর্তিত হবে।

(৩৯) শিখর

মাত্রা সংখ্যা—১৭। বিভাগ—৪। ১ম ও ২য় বিভাগে ৬টি করে মাত্রা, ৩য় বিভাগে ২টি মাত্রা এবং ৪র্থ বিভাগে ৩টি মাত্রা (৬ | ৬ | ২ | ৩)। ৩টি তালি (১, ৭ ও ১৫ মাত্রায়) এবং একটি খালি (১৩ মাত্রায়)। মতান্তরে ৫।৬।২।৪ করে চারটি বিভাগ এবং চারটিই তালি। আবার ৪।৭।২।৪ বিভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই পঞ্চ বিভাগে তালির সংখ্যাও পাঁচটি।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঠেকা :	ধা	ত্রক	ধিন	নক	থুন্	গা |	ধিন্	নক্	ধুম	কিট	তক	ধেৎ |
	×						২					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধা	তিট |	কৎ	গদি	গন
০		৩		

॥ দুইগুণ (৮½ মাত্রার পর থেকে) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ত্রক	ধিন্	নক	থুন্	গা |	ধিন্	নক্	ऽধা	ত্রকধিন্	নকথুন্	গাধিন্
×						২					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১
নকধুম	কিটতক |	ধেৎধা	তিটকত	গদিগন |	ধা
০		৩			×

॥ তিনগুণ (১১১/৩ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ত্রক ধিন্ নক থুন্ গা | ধিন্ নক্ ধুম কিট্ তক sধাত্রক |
x ২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১
ধিন্নকথুন্ গাধিন্নক | ধুমকিটতক ধেৎধাতিট কতগদিগন | ধা
০ ৩ x

॥ চারগুণ (১২১/৪ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ত্রক ধিন্ নক থুন্ গা | ধিন্ নক্ ধুম কিট তক ধেৎ |
x ২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১
ssধা ত্রকধিন্নকথুন্ | গাধিন্নকধুম কিটতকধেৎধা তিটকতগদিগন | ধা
০ ৩ x

॥ আড়লয় (৫২/৮ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ত্রক ধিন্ নক থুন ssধা | sত্রক ধিন্sন কথুন্s গাsধিন sনক ধুমকি
x ২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১
টতক ধেৎsধা | sতিট কতগ দিগন | ধা
০ ৩ x

॥ কুআড়লয় (৫৫/৮ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ত্রক ধিন্ ssধাss sত্রsকs ধিন্sssন | sকsথুনs ssগাss sধিন্ss
x ২

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
নsকsধু sমকিs টsতsকs | sধেৎss ধাsssতি | sটsকs তsগsদি
০ ৩

১৭ ১
sগsনs | ধা
x

॥ বিআড়লয় (৭৳ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ত্রক ধিন্ নক থুন গা | ধিন্ ssধাsssত্র sকsধিন্sss নsকsথুন্ss
× ২

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
sগাsssধিন্s ssনsকsথু | sনsকিsটs তsকsথেৎ | sধাsssতিs
০ ৩

১৬ ১৭ ১
টsকsতsগ sদিsগsনs | ধা
×

(৪০) বিষ্ণু তাল

মাত্রা সংখ্যা—১৭। ১ম বিভাগে ২টি, ২য় বিভাগে ৩টি, ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (২ | ৩ | ৪ | ৪ | ৪)। ৪টি তালি (১, ৩, ৬ ও ১০ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (১৪ মাত্রায়)। মতান্তরে ৪|২| ৪ | ২ | ২ | ৩ করে ছয়টি বিভাগ এবং এই ছয়টি বিভাগে ৬টি তালি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ঠেকা : ধিন্ না | ধিন্ ধিন্ না | ধিন ত্রক ধি না
× ২ ৩

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
ধিন্ ধিন্ না ধিন্ | ধি না ধি না
৪ ০

ঠেকা (মতান্তরে) : ধা sধিন্ না | ধা তেরেকেটে | ধা ধা ধিন্ না |
× ২ ৩

ধা তেরেকেটে | ধিন্ s | ধাগে তেটে তিন্
৪ ৫ ৬

বিষ্ণুতালের যাবতীয় দরকারীর কাজ শিখর তালের মতই হবে। তবে বোল, বিভাগ ইত্যাদি পরিবর্তিত হবে।

(৪১) মত্ততাল

মাত্রাসংখ্যা—১৮। বিভাগ—৯। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা ৬টি তালি (১, ৫, ৭, ১১ ১৩ ও ১৫ মাত্রায়) এবং ৩টি খালি (৩, ৯ ও ১৭ মাত্রায়)। মতান্তরে ৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ করে ছয়টি বিভাগ এবং এই ছয়টি বিভাগে ৬টি তালি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ঠেকা : ধা ঽ | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ঽক | তি ট | ক ত |

× ০ ২ ৩ ● ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮

গ দি | গ ন

৬ ০

॥ দুইগুণ (১০ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা ঽ | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড | ন ধাঽ | ঘিড় নক | ঘিড় নক |

× ● ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

তিট কত | গদি গন | ধা

৬ ০ ×

॥ তিনগুণ (১৩ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা ঽ | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ক | তি ট | ধাঽঘি ড়নক |

× ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ঘিড়ন কতিট | কতগ দিগন | ধা

৬ ০ ×

॥ চারগুণ (১৩½ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ধা ऽ | ঘি ড় | ন ক | ঘি ড় | ন ক | তি ট | ক ऽऽধাऽ |

× ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

ঘিড়নক ঘিড়নক | তিটকত গদিগন | ধা

৬ ০ ×

॥ আড়লয় (৭ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ধা ऽ | ঘি ড় | ন ক | ধাऽऽ ऽঘিऽ | ডऽন ऽকऽ | ঘিऽড ऽনऽ

× ০ ২ ৩ ০ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১

কऽতি ऽটऽ | কऽত ऽগऽ | দিऽগ ऽনऽ | ধা

৫ ৬ ০ ×

॥ বিআড লয় (৬¾ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা ऽ | ঘি ऽऽऽধাऽ | ৪ऽ৪৪ऽ ऽঘিऽऽऽ | ড়ऽऽऽন ऽऽऽকऽ

× ০ ২ ৩

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

ऽऽঘিऽऽ ऽড়ऽऽऽ | নऽऽক ऽऽऽতি | ऽऽটऽऽ ऽকऽऽऽ | তऽऽऽগ ऽऽদিऽ

০ ৪ ৫ ৬

১৭ ১৮ ১

ऽऽগऽऽ ऽনऽऽऽ | ধা

০ ×

॥ কুআড়লয় (৭¼ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা ऽ | ঘি ড় | ন ক | ঘি ऽऽऽऽऽধাऽ | ऽऽऽऽऽऽঘি ऽऽऽড়ऽऽऽ

× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
নঃsssক ঃধিssssড়s | ssনssক sssতিsss | টsssকss sতssssগs
৪ ৫ ৬

১৭ ১৮ ১
ssধিsssগ sssনsss | ধা
০ ×

(৪২) লক্ষ্মীতাল

মাত্রাসংখ্যা—১৮। বিভাগ—১৫। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১৫শ বিভাগে দুটি করে মাত্রা এবং অন্যান্য সকল বিভাগে ১টি করে মাত্রা ১৫টি তালি, খালি নাই।

মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা—৩৬। ১৮ মাত্রার লক্ষ্মীতালে অনেকে প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা নিয়ে ১৮টি বিভাগও করে থাকেন এবং ১৫টি তালি এবং ৩টি খালির উল্লেখ করেছেন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা: ধিন্ | ধিড় | নক ধেৎ | ধেৎ | ধিড় | নক দিন্ | তা | তিট
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
কত | ধা | দিন্ | তা | কিট | তক | গদি গন
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

লক্ষ্মী তালের যাবতীয় লয়কারীর কাজ পূর্ববর্তী মত্ত তালের অনুরূপ হবে, কেবলমাত্র বোল, বিভাগ এবং তালচিহ্ন পরিবর্তিত হবে।

(৪৩) কৈদ ফরোদস্ত

মাত্রা সংখ্যা—১৯। বিভাগ—৭। ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা; ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বিভাগে ২টি করে এবং ৭ম বিভাগে ৪টি মাত্রা। (৩ | ৩ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ৪)। ৬টি তালি (১ম, ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৩শ ও ১৬শ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৪র্থ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ঠেকা : ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা | ধাগে
× ০ ২ ৩ ৪

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
তেরেকেটে তাগে নেতা গেনে | তেটে কতা গদি গন
৫ ৬

॥ দুইগুণ (৯ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ ऽধা
× ০ ২ ৩

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধিন্ ধাগে থুন না | কেটেধেৎ তাকৎ তাধাগে | তেরেকেটে তাগে
৪ ৫ ৬

১৭ ১৮ ১৯ ১
নেতাগেনে তেটেকতা গদিগন | ধা
×

॥ তিনগুণ (১২ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা
× ০ ২ ৩

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধাগে তেরেকেটে | ऽऽধা ধিন্ধাগেথুন্ নাকেটেধেৎ | তাকৎতা
৪ ৫ ৬

১৭ ১৮ ১৯ ১
ধাগেতেরেকেটেতাগে নেতাগেনেতেটে কতাগদিগন | ধা
×

॥ চারগুণ (১৪ই মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে
× ০ ২ ৩ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
তাগে নেতা ১ধাধিন্‌ধাগে | ধুন্‌নাকেটেধেৎ তাকৎতাধাগে
৫ ৬

১৮ ১৯ ১
তেরেকেটেতা গেনেতাগেনে তেটেকতাগদিগন | ধা
×

॥ আড়লয় (৬ষ্ঠ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ধিন্‌ ধাগে | ধুন না কেটে | ১ধা১ ধিন্‌১ধাগে | ১ধুন্১
× ০ ২ ৩

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
না১কেটে | ১ধেৎ১ তা১কৎ | ১তা১ ধাগে১তেরে কেটেতাগে১
৪ ৫

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ১
নেতা১গেনে ১তেটে১ কতা১গদি ১গন১ | ধা
৬ ×

॥ কুআড়লয় (৩ষ্ঠ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন ধাগে | ১১১ধা ১১১ধিন১ ১১ধা১গে | ১ধুন্১১১ না১১১কে
× ০ ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
১টে১ধেৎ১ ১১তা১১ | ১কৎ১১১ তা১১১ধা | ১গে১তেরে
৩ ৪ ৫

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
কেটেতা১গে ১নেতা১১১ | গে১নে১তে ১টে১ক১ তা১গদি১১
৬

১৯ ১
১গন১১১ | ধা
×

॥ বিআড় লয় (৮২ মাত্রার পর হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | ঽধাঽঽঽধিন্ঽ
× ০ ২ ৩

১০ ১১ ১২ ১৩
ঽঽধাঽগেথুন | ঽঽঽনাঽঽঽ কেঽটেঽঽধেৎঽ | ঽতাঽঽঽকৎঽ
৪ ৫

১৪ ১৫ ১৬ ১৭
ঽঽতাঽঽঽধা ঽগেঽতেরেকেটে | তাগেঽনেঽঽতা ঽগেঽনেতেটেঽ
৬

১৮ ১৯ ১
ঽকতাঽঽগদি ঽঽঽগনঽঽঽ | ধা
×

(৪৪) গণেশ তাল

মাত্রা সংখ্যা—২১ বিভাগ—১০। ১ম, ৩য় ও ৬ষ্ঠ বিভাগে ৪টি করে, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম বিভাগে ১টি করে এবং ১০ম বিভাগে ৩টি মাত্রা (৪ | ১ | ৪ | ১ | ১ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ৩)। ১০টি তালি (১, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, এবং ১৯মাত্রায়), খালি, নেই। মতান্তরে এই তালের মাত্রাসংখ্যা ১৮, বিভাগ—৫টি (৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ঠেকা: ধা ধা দেন তা | কৎ | তাগে ধা দেন তা | কৎ | তিট।
× ২ ৩ ৪ ৫

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
তা ধাগে দেন্ তা | থুন | না | তিট | কত গদি গন
৬ ৭ ৮ ৯ ১০

॥ দুইগুণ (10ই মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 10 ১১ ১২ ১৩
ধা ধা দেন তা | কৎ | তাগে ধা দেন তা | কৎ | ঽধা | ধাদেন তাকৎ
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
তাগেধা দেনতা | কৎতিট | তাধাগে | দেন্‌তা | খুন্‌না তিটকত গদিগন
৭ ৮ ৯ ১০

১
| ধা
×

॥ তিনগুণ (১৫ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ধা ধা দেন্‌ তা | কৎ | তাগে ধা দেন তা | কৎ | তিট | তা ধাগে
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
দেন্‌ ধাধাদেন্‌ | তাকৎতাগে | ধাদেন্‌তা | কৎতিটতা
৭ ৮ ৯

১৯ ২০ ২১ | ১
ধাগেনেতা খুন্‌নাতিট কতগদিগন ধা
১০ ×

॥ চারগুণ (১৫ৢ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ধা ধা দেন্‌ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্‌ তা | কৎ | তিট | তা ধাগে
× ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
দেন্‌ তা | sssধা | ধাদেন্‌তাকৎ | তাগেধাদেন্‌তা | কৎতিটতাধাগে
৭ ৮ ৯ ১০

২০ ২১ ১
দেন্‌তাখুন্‌না তিটকতগদি | গন | ধা
×

॥ দেড়গুণ (৮ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধা ধা দেন্‌ তা | কৎ | তাগে ধা ধাsধা sদেনs | তাsকৎ | sতাগেs
× ২ ৩ ৪ ৫

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
ধাsদেন্ sতাs কৎsতিট sতাs | ধাগেদেন্ | sতাs | ধুন্sনা
৬ ৭ ৮ ৯

১৯ ২০ ২১ ১
sতিটs কতsগদি sগনs | ধা
১০ ×

॥ কুআড় লয় (৪½ মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ধা দেন্ তা | sধাsss | ধাsssদেন্ ssতাs ssকৎ sতাsগেs
× ২ ৩

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধাsssদেন | sssতাs | ssকৎss sতিsটs তাsssধা sগেsদেনs
৪ ৫ ৬

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ১
ssতাss | sধিন্sss | নাsssতিট | sssকত ssগদিss sগনsss | ধা
৭ ৮ ৯ ১০ ×

॥ বিআড়লয় (১০ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ধা দেন্ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্ তা | ধাsssধাss
× ২ ৩ ৪

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
sদেন্ sssতাs | ssকৎsssতা sগেsধাsssদেন্ sssতাss sকৎsssতিট
৫ ৬

১৬ ১৭ ১৮ ১৯
ssতাsssধা | sগেssদেন্sss | তাsssধুন্ss | sনাsssতিটs
৭ ৮ ৯ ১০

২০ ২১ ১
ssকতsssগদি sssগনsss | ধা
×

(৩৫) ব্রহ্মতাল

মাত্রা সংখ্যা—২৮। বিভাগ—১৪। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ১০টি তালি (১, ৫, ৭, ১১, ১৩; ১৫, ১৯, ২২, ২৩ ও ২৫ মাত্রায়) এবং ৪টি খালি (৩, ৯, ১৭ ও ২১ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা : ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা
× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
ধেৎ তা | ধাগে তেটে | তাগে তেটে | থুন্ না | কৎ তা
৪ ৫ ৬ ০ ৭

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮
দিন্ তা | কেটে তাগ | তিট কত | গদি গন
৮ ৯ ১০ ০

॥ দুইগুণ (১৫ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা | ধেৎ তা
× ০ ২ ৩ ০ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
ধাগে তেটে | ধাতেৎ ধেৎকিট | তকধুম কিটতক | ধেৎতা ধেৎতা
৫ ৬ ০ ৭

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬
ধাগেতেটে তাগেতেটে | থুন্না কৎতা | দিনতা কেটেতাগ
৮ ৯ ১০

২৭ ২৮ ১
তিটকত গদিগন | ধা
০ ×

॥ তিনগুণ (১৮তম মাত্রার পর থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা
× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
ধেৎ তা | ধাগে তেটে | তাগে তেটে | থুন না |
৪ ৫ ৬ ০

১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
ssধা তেৎটেৎকিট | তকধুমকিট তকধেৎতা | ধেৎতাধাগে
৭ ৮ ৯

২৪ ২৫ ২৬ ২৭
তেটেতাগে তেটে | ধুননাকৎ তাদিন্‌তা | কেটেতাগতিট
১০ ০

২৮ ১
কতাগদিগন | ধা
×

॥ চারগুণ (২২ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা
× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
ধেৎ তা | ধাগে তেটে | তাগে তেটে | ধুন্‌ না | কৎ তা
৪ ৫ ৬ ০ ৭

২১ ২২ ২৩ ২৪
দিন ধাতেৎধেৎকিট | তকধুমকিটতক ধেৎতাধেৎতা
৮ ৯

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ১
ধাগেতেটেতাগেতেটে ধুন্‌নাকৎতা | দিন্‌তাকেটেতাগ তিটকতগদিগন | ধা
১০ ০ ×

॥ আড়লয় (৯ $\frac{১}{৪}$ মাত্রা থেকে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ sধাs
× ০ ২ ৩ ০

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
তেৎsধেৎ sকিটs | তকsধুম sকিটs | তকsধেৎ sতাs
৪ ৫ ৬

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
ধেৎsতা sধাগে | তেটেsতাগে sতেটেs | ধুন্‌sনা sকৎs
০ ৭ ৮

২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ১
তাsদিন্‌ sতাs | কেটেতাগ sতিটs | কতsগদি sগনs | ধা
৯ ১০ ০ ×

॥ কুআড় লয় (৫½ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক sssধাs | ssতেৎss sধেৎsss
× ০ ২ ৩

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
কিটssতক ssধুমs | ssকিটss sতকsss | ধেsssৎতা
০ ৪ ৫

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
sssধেৎs | ssতাss sধাsগেs | তেটেsssতা sগেsতেটেs
৬ ০

১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
ssধুন্‌ss sনাsss | কৎsssতা sssদিন্‌s | ssতাss sকেsটেs
৭ ৮ ৯

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ১
তাগssতিট sssকতs | ssগদিss sগনsss | ধা
১০ ০ ×

॥ বিআড় লয় (১৩ মাত্রা হতে) ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ধা তেৎ | ধেৎ কিট তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা | ধেৎ তা
× ০ ২ ৩ ০ ৪

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
ধাsssতেৎ sধেৎsssকিটs | ssতকsssধুম sssকিটsss | তকsssধেৎss
৫ ৬ ০

১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
sতাsss | ধেংssতাsssধা sগেsতেটেsss | তাsগেsতেটেss sথুন্sssনাঃ
৭ ৮

২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
sকৎsss sssদিন্sss | তাsssকেsটে sতাগssতিটs | ssকতsssগদি
৯ ১০ ০

২৮ ১
sssগনsss | ধাঃ
×

রাবীন্দ্রিক তাল

রবীন্দ্রনাথ নতুন সপ্ত তালেরপ্রবর্তন করেন এবং এই তালগুলি কর্ণাটকী সংগীতে অজানা না থাকলেও বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই তালগুলি প্রয়োগ করেন। নিম্নে মাত্রাসংখ্যাসহ তালগুলির একটি তালিকা এবং পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হল। **প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রাবীন্দ্রিক কোন তালেই খালি (ফাঁক) নেই।**

তালের নাম	মাত্রা সংখ্যা
(১) ঝম্পক	৫
(২) অর্ধঝাঁপ	৫
(৩) ষষ্ঠী	৬
(৪) রূপকড়া	৮
(৫) নবতাল	৯
(৬) একাদশী	১১
(৭) নবপঞ্চতাল	১৮

(১) ঝম্পক

মাত্রাসংখ্যা—৫। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ৩টি এবং ২য় বিভাগে ২টি (৩ | ২) মাত্রা। দুইটি তালি (১ এবং ৪ মাত্রায়)।

১ ২ ৩ ৪ ৫
ঠেকা: ধি ধি না | ধি না
× ২

(২) অর্ধঝাঁপ

মাত্রাসংখ্যা—৬। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ২টি এবং ২য় বিভাগে ৩টি মাত্রা (২ | ৩)। দুইটি তালি (১ম ও ৩য় মাত্রায়)। কর্ণাটকী তাল রূপকমের (তিস্রম) অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫
ঠেকা: ধি না | ধি ধি না
× ২

(৩) ষষ্ঠীতাল

মাত্রাসংখ্যা—৬। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ২টি এবং ২য় বিভাগে ৪টি মাত্রা (২ | ৪)। দুইটি তালি (১ম এবং ৩য় মাত্রায়)। কর্ণাটকী রূপকের (চতস্রম্) অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ঠেকা: ধি না | ধি ধি নাগে তেটে
× ২

(৪) রূপকড়া

মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ- ৩। ১ম এবং ৩য় বিভাগে ৩টি করে ও ২য় বিভাগে ২টি মাত্রা (৩ , ২ | ৩)। ৩টি তালি (১ম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায়)। কর্ণাটকী তাল মঠম্ (তিস্রম্ -এর অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা: ধি ধি না | ধি না | ধি ধি না
× ২ ৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা (পাখোয়াজ): ধা দেন্ তা | কৎ তেটে | কতা গদি গন
× ২ ৩

(৫) নবতাল

মাত্রাসংখ্যা—৯। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ২টি করে মাত্রা (৩ | ২ | ২ | ২)। ৪টি তালি (১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম মাত্রায়)। কর্ণাটকী ত্রিপুট (খণ্ডম্) তালের অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ঠেকা: ধি ধি না | ধি না | ধি ধি | নাগে তেটে
× ২ ৩ ৪

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ঠেকা (পাখোয়াজ): ধা দেন্ তা | কৎ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে
× ২ ৩ ৪

(৬) একাদশী

মাত্রাসংখ্যা—১১। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ২টি করে এবং ৪র্থ বিভাগে ৪টি মাত্রা (৩ | ২ | ২ | ৪)। ৪টি তালি (১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম মাত্রায়)। প্রাচীন মণিতালের অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ঠেকা: ধি ধি না | ধি না | ধি না | ধি ধি নাগে তেটে
× ২ ৩ ৪

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা (পাখোয়াজ): ধা দেন্ তা | কৎ তাগে | দেন্ তা | তেটে
× ২ ৩ ৪

৯ ১০ ১১
কতা গদি ঘেনে

(৭) নবপঞ্চতাল

মাত্রা সংখ্যা—১৮। বিভাগ—৫টি। ১ম বিভাগে ২টি, ২য়, ৩য় ৪র্থ

এবং ৫ম বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (২ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৫টি তালি (১, ৩, ৭, ১১ ও ১৫ মাত্রায়)। কর্ণাটকী সিংহ তালের অনুরূপ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা : ধা তেরেকেটে | ধিন্ ধা ধাগে ধিন্ | ধিন্ ধা তা তেটে
× ২ ৩

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
তিন তা কৎ তাগে | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা
৪ ৫

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ঠেকা (পাখোয়াজ) : ধা গে | ধা গে দিন্ তা | কৎ তাগে দিন্ তা |
× ২ ৩

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
তেটে ধা দিন্ তা | তেটে কতা গদি ঘেনে
৪ ৫ ০

উপরি উক্ত সাতটি তাল ব্যতীত একতাল. ধামার এবং সুলতালের প্রচলিত ছন্দ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। যেমন -একতালে দ্বিমাত্রিকের বদলে তিনি ত্রিমাত্রিক ছন্দে ১২ মাত্রাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন (৩.৩।৩।৩); রাবীন্দ্রিক ধামারের ছন্দ বিভাগ—৩।২।২।৩।৪ এবং সুরফাঁকতালের ছন্দ বিভাগ ৪ | ২ | ৪।

কয়েকটি কীর্তনাঙ্গ তাল

(১) লোফা : মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৩টি তালি এবং ১টি খালি।

ঠেকা : থিন তাদিন | ত্রেকেটে থিন | থিন দাথিন | ত্রেকেটে থিন
× ২ ০ ৩

(২) ধীরা : মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৪টি তালি, ফাঁক নেই।

ঠেকা : ধাঁ ধাঁ | তা তা | ধিধি তাধি | তা উরন্
× ২ ৩ ৪

ডাঁশপাহিড়া বা দাশপেড়ে : মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ—২টি। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা। ১টি তালি এবং ১টি খালি। একে অনেকে মধ্যম দাশপেড়ে বলে থাকেন। মতান্তরে মাত্রাসংখ্যা—১৬। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা। ৩টি তালি এবং ১টি খালি।

ঠেকা : ধা ধি ধি তা | তাক্তে নাগেধিন্ নাগেধিন্ ধিনা
× ০

ঝপতাল : মাত্রাসংখ্যা—১২। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা। ৩টি তালি ও ১টি খালি। গড়খেমটা তালের সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য আছে। অনেকে একে "লোফা" তাল বলেন।

ঠেকা : ধাঁ উ দি | দা ঘি না | তাঁ উ তি | তা ধি না
× ২ ০ ৩

ঠেকা (মতান্তরে) : ধিন ত্রেকে তাক ধিন | ত্রেগে ধিন ধিন ধিন | ধি ইন
× ২ ০

তা s | তে টে তা s
৩

(৫) তেওট : মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ সাতটি এবং প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৩টি তালি এবং ৪টি খালি। মতান্তরে ৩ | ২ | ২ | ৩ | ২ | ২ করে ৬টি বিভাগ। ৫টি তালি, ১টি খালি। অথবা ৩ | ৪ | ৩ | ৪ করে ৪টি বিভাগ। এই চারটি বিভাগে ৩টি তালি এবং ১টি ফাঁক।

ঠেকা : ধাঁ ধি | ধাঁ ধি | ধিধিতাধি তেরেকেটে | তা তেটে | তেটে তা
× ০ ২ ৩ ০

তাতেটে তাকধেই | তেটে ধিটি
৪ ০

ঠেকা (মতান্তরে) : ঝাঁ থি গুর্গুর্ | ঝাঁ থি | দাঘী নিতা |
× ২ ৩

তা তি খুরখুর তা তি | থিথি গুরগুর
০ ৩ ৪

(৬) দোঠুকী : মাত্রাসংখ্যা—১৪। ৩ | ৪ | ৩ | ৪ করে চারটি বিভাগ। ৩টি তালি এবং ১টি খালি।

ঠেকা : ঝাঁ থি তা | ধিনs তা s | তা গুড়্গুড়্ | তেৎ s তা s
× ২ ০ ৩

(৭) ছোট দশকুশী : মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৭টি। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৪টি তালি এবং ৩টি খালি।

ঠেকা : ধা —দ্দি | নাক ধিনি | ধা —দ্দি | নাক ধিনি | ধা উব্উদ্ |
× ২ ০ ৩ ০

ধাৎ তা | তেটে তেটে
৪ ০

(৮) বিরাম দশকুশী : মাত্রাসংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪টি। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে চারটি করে এবং ৩য় বিভাগে ২টি মাত্রা। চারটি বিভাগে চারটিই তালি, খালি নেই

ঠেকা : তাত্রেটেকেটেধি তাতেটে তাতেটে তাতেটে | তাত্রেকেটেধেই
× ২

তাতেটে তাতেটে তাতেটে | ঝাঁ গুরগুর | ধাৎ তা তেটে তেটে
৩ ৪

(৯) কাটাধরা : মাত্রাসংখ্যা—১৬। বিভাগ—৮টি। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা। ৬টি তালি এবং ২টি খালি।

ঠেকাঃ তা থিথি | উব্উব্ উব্উব্ | দি দা | ধে নে | — ৎধি | নাক ধি |
x ০ ২ ৩ ০ ৪

ৎ তিতি | তিটি তিটি
৫ ৬

(১০) বড় দশকুশী: মাত্রাসংখ্যা—২৮। বিভাগ – ৮টি। ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বিভাগে ৪টি করে এবং ২য় ও ৮ষ্ঠ বিভাগে ২টি করে মাত্রা। আটটি বিভাগে ৫টি তালি এবং ৩টি খালি।

ঠেকাঃ তা তেত্তা তেত্তা খেটেতাথি | তা খুড়্খুড়্খুড়্খুড়্
x ২

তা তেত্তা তেত্তা খেটা | ধৈয়া তাধৈ তাধৈ তাধৈ
০ ৩

ধাঁথি তাগি ধাঁথি ধাঁথিথি | ধাঁ গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্
০ ৪

ধাঁ ধৈ তেত্তা খেটি | তা তেত্তা তেত্তা খেটি
০ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমান মাত্রার তালের মধ্যে তুলনা

আলোচ্য অধ্যায়ে নিম্নলিখিত সমমাত্রাসংখ্যাসম্পন্ন তালগুলির মধ্যে তুলনা করা হয়েছে :—

(১) ৭ মাত্রার তাল : তেওরা—রূপক—পোস্ত।

(২) ৮ ,, ,, : কাহারবা—আদ্ধা—ধুমালী—ঠুংরী—কাওয়ালী।

(৩) ১০ ,, ,, : ঝাঁপতাল—সুরফাঁক—ঝম্পা।

(৪) ১১ ,, ,, : রুদ্র—মণি—কুম্ভ।

(৫) ১২ ,, ,, : একতাল—চৌতাল—খেমটা—আড়খেমটা—বিক্রম।

(৬) ১৪ ,, ,, : (ক) ঝুমরা—আড়াচৌতাল—ধামার এবং (খ) ফরোদস্ত—দীপচন্দী।

(৭) ১৫ ,, ,, : (ক) পঞ্চমসওয়ারী—গজঝম্প এবং (খ) যতিশেখর—চিত্রা।

(৮) ১৬ ,, ,, : (ক) ত্রিতাল—তিলোয়াড়া—পাঞ্জাবী; (খ) আড়াঠেকা—টপ্পা—যৎ এবং (গ) বসারী ও অথমঞ্জরী সওয়ারী।

(৯) ১৭ ,, ,, : শিখর—বিষ্ণু।

(১০) ১৮ ,, ,, : মত্ত—লক্ষ্মী।

(১) তেওরা—রূপক—পোস্ত

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা সাত; (২) বিভাগ তিনটি; (৪) ১ম বিভাগে ৩টি, ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে মাত্রা এবং (৫) ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় তালি।

॥ বিভিন্নতা ॥

তেওরা	রূপক	পোস্ত
(১) ১ম মাত্রায় সম।	(১) ১ মাত্রায় খালি।	(১) ১ম মাত্রায় সম।
(২) ৪র্থ ও ৬ষ্ট মাত্রায় যথাক্রমে ২ ও ৩ তাল।	(২) ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় যথাক্রমে ১ ও ২ তাল।	(২) ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় ২ ও ৩ তাল।
(৩) খালি নেই।	(৩) খালি আছে।	(৩) খালি নেই।
(৪) গতি মধ্যম।	(৪) গতি শ্লথ।	(৪) গতি মধ্যম।
(৫) মতান্তর নেই।	(৫) মতান্তরে ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় ২ ও ৩ তাল।	(৫) মাত্রাসংখ্যা ও বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে।

(২) কাহারবা—আদ্ধা—ধুমালী—ঠুংরী—কাওয়ালী

সমতা: (১) মাত্রাসংখ্যা ৮; (২) ১টি করে খালি আছে; এবং (৩) ৫ মাত্রায় খালি।

॥ বিভিন্নতা ॥

কাহারবা	আদ্ধা	ধুমালী ও ঠুংরী
১) ২টি বিভাগ।	১) ৪টি বিভাগ।	১) ৪টি বিভাগ।
২) প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা।	২) প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।	২) প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।
৩) ১টি তালি।	৩) ৩টি তালি।	৩) ৩টি তালি।
৪) মতান্তর নেই।	৪) মতান্তরে সেতার-খানি আদ্ধা তালে ১৬ মাত্রা।	৪) মতান্তরে ধুমালী ও ঠুংরী একই তাল এবং ৪ | ৪ করে ২টি বিভাগ।
৫) আড়ি নেই।	৫) আড়ি আছে।	৫) আড়ি নেই।

কাওয়ালী: (১) ২টি বিভাগ; (২) প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা; (৩) ২টি তালি; (৪) মতান্তরে ১টি তালি খালি এবং (৫) আড়ি নেই।

(৩) ঝাঁপতাল— সুরফাঁক—ঝম্পা

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১০ ; (২) ৩টি তালি ; এবং (৩) ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি মাত্রা।

॥ বিভিন্নতা ॥

ঝাঁপতাল	সুরফাঁক	ঝম্পা
১) ২।৩।২ ৩ করে ৪টি বিভাগ।	১) প্রতি বিভাগে ২ মাত্রা করে ৫টি বিভাগ।	১) ২ | ৩ | ২ | ৩ করে ৪টি বিভাগ।
২) ১টি ফাঁক।	২) ২টি ফাঁক।	২) ১টি ফাঁক।
৩) ১ম, ৩য় ও ৮ম মাত্রায় তালি।	৩) ১ম, ৫ম, ও ৭ম মাত্রায় তালি।	৩) ১ম, ৩য় ও ৮ম মাত্রায় তালি।
৪) একটি মাত্র নামে পরিচিত।	৪) সুলতাল নামেও পরিচিত	৪) নাম নিয়ে মতান্তর নেই।
৫ কোন বিষয়ে মতান্তর নেই।	৫) বিভাগ ও তালি নিয়ে মতান্তর আছে।	৫) মাত্রাসংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে।

(৪) রুদ্র—মণি—কুম্ভ

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১১, (২) ১ম, ৪র্থ ও ৯ম মাত্রায় তালি ; এবং (৩) তিনটিই অপ্রচলিত তাল।

॥ বিভিন্নতা ॥

রুদ্রতাল	মণিতাল	কুম্ভতাল
১) বিভাগ ১১টি।	১) বিভাগ ৪টি।	১) বিভাগ ১১টি।
২) প্রতি বিভাগে ১টি মাত্রা।	২) ৩।২।৩।৩ ছন্দ।	২) প্রতি বিভাগে ১টি মাত্রা।
৩) ৮টি তালি এবং ৩টি খালি।	৩) ৪টি তালি, খালি নেই।	৩) ৮টি তালি ও ৩টি খালি।
৪) ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ এবং 10 মাত্রায় তালি।	৪) ১, ৪, ৬, এবং ৯ মাত্রায় তালি।	৪) ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ মাত্রায় তালি।
৫) ৩, ৭, ও ১১ মাত্রায় খালি।	৫) খালি নেই।	৫) ২, ৬, ও ১১ মাত্রায় খালি।
৬) মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ তালি ও খালি নিয়ে মতান্তর আছে।	৬) কোনও মতান্তর নেই।	৬) তালি ও খালি নিয়ে মতান্তর আছে।

(৫) একতাল—চৌতাল—খেমটা—আড়খেমটা—বিক্রম

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১২; (২) কমপক্ষে তিনটি বিভাগে তালি আছে এবং (৩) কমপক্ষে একটি বিভাগে খালি আছে।

। বিভিন্নতা ।

একতাল	চৌতাল	খেমটা—আড়খেমটা
১) ৬টি বিভাগ।	১) ৬টি বিভাগ।	১) ৪টি বিভাগ।
২) প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।	২) প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।	২) প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা।
৩) ৪টি তালি এবং ২টি খালি।	৩) ৪টি তালি এবং ২টি খালি।	৩) ৩টি তালি ও ১টি খালি।
৪) ১,৫,৯ ও ১১ মাত্রায় তালি।	৪) ১,৫,৯ও ১১ মাত্রায় তালি।	৪) ১,৪ ও ১০ মাত্রায় তালি।
৫) ৩য় ও ৫ম মাত্রায় খালি।	৫) ৩য় ও ৫ম মাত্রায় খালি।	৫) ৭ম মাত্রায় খালি।
৬) বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে	৬) মতান্তর নেই।	৬) মাত্রাসংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে।

বিক্রম : (১) ৪টি বিভাগ; (২) প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা; (৩) ৩টি তালি এবং ১টি খালি; (৪) ১,৩ ও ৯মাত্রায় তালি; (৫) ৬ষ্ঠ মাত্রায় খালি, (৬) মতান্তর নেই। উপরে খেমটা—আড়খেমটায় উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনও বিভিন্নতার উল্লেখ নেই। খেমটা ও আড়খেমটার মধ্যে তাই নিম্নলিখিত বিভিন্নতা উল্লেখ্য :

প্রথমতঃ, খেমটা তালের গতি সরল এবং চার-এর ছন্দে এর প্রথম পড়ে, কিন্তু আড়খেমটা হচ্ছে খেমটার আড় এবং প্রতি ৩য় মাত্রায় এর প্রথম পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, খেমটা তাল অপেক্ষা আড়খেমটা বিলম্বিত লয়ে প্রযোজ্য।

(৬) ক) ঝুমরা—আড়াচৌতাল—ধামার

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১৪ ; (২) বিভাগ—৪টি এবং (৩) ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে তালি এবং ৩য় বিভাগে খালি।

। বিভিন্নতা ।

ঝুমরা	আড়াচৌতাল	ধামার
১) ৩।৪।৩।৪ করে চারটি বিভাগ।	১) ২ মাত্রা করে ৭টি বিভাগ	১) ৫।২।৩।৪ করে ৪টি বিভাগ।
২) ৪র্থ ও ১১শ মাত্রায় ২য় ও ৩য় তালি।	২) ৩য় ও ৭ম মাত্রায় ২য় ও ৩য় তালি।	২) ৬ ও ১১ মাত্রায় ২য় ও ৩য় তালি।
৩) ১টি মাত্র খালি ৮ম মাত্রায়।	৩) ২টি খালি ৩য় ও ৯ম মাত্রায়।	৩) ৮ষ্ঠ মাত্রায় ১টি খালি।
৪) বিভাগ নিয়ে মতান্তর নেই।	৪) বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে।	৪) বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে।

(খ) ফরোদস্ত—দীপচন্দী

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১৪ ; (২) ১ম মাত্রায় খালি এবং (৩) ৪র্থ বিভাগে ৩য় তালি।

॥ বিভিন্নতা ॥

ফরোদস্ত	দীপচন্দী
১) ৭টি বিভাগ এবং প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা।	১) ৩ | ৪ | ৩ | ৪ করে চারটি বিভাগ।
২) ৫টি তালি ও ২টি খালি।	২) ৩টি তালি এবং ১টি খালি।
৩) ২য় বিভাগে ১ম খালি।	৩) ৩য় বিভাগে ১টি মাত্র খালি।
৪) বিভাগ, তালি ও খালি নিয়ে মতান্তর আছে।	৪) বিভাগ, তালি ও খালি নিয়ে মতান্তর নেই।
৫) নাম নিয়ে মতান্তর নেই।	৫) মতান্তরে 'চাঁচর' তাল বলা হয়।

(৭) ক) পঞ্চম সওয়ারী—গজঝম্প

সমতা: (১) মাত্রাসংখ্যা –১৫, (২) বিভাগ চারটি (৩) ৩টি তালি এবং ১টি খালি। (৩ ১ম ২য় ও ৪র্থ বিভাগে তালি এবং ৩য় বিভাগে খালি।

॥ বিভিন্নতা ॥

পঞ্চম সওয়ারী	গজঝম্প
১) ঠেকা নিয়ে মতান্তর আছে।	১) ঠেকা নিয়ে মতান্তর নেই
২) তালি ও বিভাগ নিয়ে মতভেদ আছে।	২) তালি ও বিভাগ নিয়ে মতান্তর নেই।
৩) ৮ম মাত্রায় খালি।	৩) ৯ম মাত্রায় খালি।
৪) ৪র্থ মাত্রায় ২য় তালি।	৪) ৫ম মাত্রায় ২য় তালি।
৫) ৩ | ৪ | ৪ | ৪ অথবা ৪।৪।৪।৩ করে চারটি বিভাগ।	৫) ৪ | ৪ | ৩ | ৪ করে চারটি বিভাগ।

(খ) যতিশেখর—চিত্রা

সমতা: (১) মাত্রাসংখ্যা—১৫; (২) ১ম, ২য়, ও ৪র্থ বিভাগে তালি, (৩) শেষ বিভাগে ২টি মাত্রা এবং (৪) দুইটি তালই অপ্রচলিত।

॥ বিভিন্নতা ॥

যতিশেখর	চিত্রা
১) বিভাগ ১৫টি।	১) বিভাগ ৫টি।
২) ১ম বিভাগে ১টি, ২য় এবং ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং ৪র্থ ও ৫ম বিভাগে ১টি করে মাত্রা।	২) ২ | ৩ | ৪ | ৪ | ২ করে পাঁচটি বিভাগ।
৩) ১ম, ২য় ও ৩য় তালি যথাক্রমে ১ম, ২য় এবং ৪র্থ মাত্রায়।	৩) ১ম, ২য় ও ৩য় তালি যথাক্রমে ১ম, ৩য় এবং ১০ম মাত্রায়।
৪) খালি নেই।	৪) ৬ষ্ঠ এবং ১৪শ মাত্রায় ২টি খালি।
৫) ঠেকা এবং বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে।	৫) ঠেকা এবং বিভাগ নিয়ে মতান্তর নেই।

৮) (ক) ত্রিতাল—তিলোয়াড়া—পাঞ্জাবী

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১৬ ; (২) বিভাগ—৪টি ; (৩) ৩টি তালি এবং ১টি খালি ; (৪) ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিভাগে তালি এবং ৩য় বিভাগে খালি।

॥ বিভিন্নতা ॥

ত্রিতাল	তিলোয়াড়া	পাঞ্জাবী
১) বহুল প্রচলিত তাল।	১) অল্প প্রচলিত তাল।	১) প্রায় অপ্রচলিত তাল।
২) মধ্য এবং দ্রুতলয়ে বাজান হয়।	২) বিলম্বিত লয়ে বাজান হয়।	২) মধ্যলয়ে বাজান হয়।
৩) ঠেকা নিয়ে মতান্তর নেই।	৩) ঠেকা নিয়ে মতান্তর আছে।	৩) ঠেকা নিয়ে মতান্তর নেই।
৪) কোন মাত্রাতেই আড়ি নেই,	৪) ২য়, ৪র্থ, ১০ম এবং ১২শ মাত্রায় আড়ি আছে।	৪) প্রতি বিভাগের মাঝখানের দুইটি মাত্রায় আড়ি আছে।

(খ) টপ্পা (আড়াঠেকা)—যৎ

সমতা : পূর্ববর্তী 'ত্রিতাল—তিলোয়াড়া—পাঞ্জাবী'র অনুরূপ

॥ বিভিন্নতা ॥

টপ্পা (আড়াঠেকা)	যৎ
১) হিন্দুস্থানী টপ্পা তাল বাংলাদেশে আড়াঠেকা নামে পরিচিত।	১) যৎ তাল অন্য কোন নামে পরিচিত নয়।
২) প্রতি বিভাগের ২য় মাত্রায় আড়ি আছে	২) আড়ি আছে এবং ২, ৪, ৮, ১০, ১২ ও ১৬ মাত্রায় অবগ্রহ।
৩) টপ্পা অঙ্গের গীতে এই তাল প্রযুক্ত হয়।	৩) টপ্পা ও ঠুংরী অঙ্গের গীতে এই তাল প্রযুক্ত হয়।
৪) মাত্রাসংখ্যা নিয়ে মতান্তর নেই।	৪) মতান্তরে মাত্রাসংখ্যা ৭ অথবা ৮।
৫) অপ্রচলিত তাল।	৫) ৮ মাত্রায় যৎ তালই সর্বাধিক প্রচলিত, ৭ কিংবা ১৬ মাত্রার যৎ বিশেষ প্রচলিত নয়।

(গ) বসারী ও অথমঞ্জরী সওয়ারী : এই দুইটি তালের মাত্রাসংখ্যা এবং বিভাগের মধ্যে সমতা আছে, কেবলমাত্র তালি ও খালির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। বসারী সওয়ারীতে চারটি তালি এবং চারটি খালি, কিন্তু অথমঞ্জরী সওয়ারীতে পাঁচটি তালি এবং তিনটি খালি।

(৯) শিখর—বিষ্ণু

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১৭; (২) একটি মাত্র খালি; (৩) বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে; (৪) মতান্তরে খালি নেই এবং (৫) উভয় তালই অপ্রচলিত।

॥ বিভিন্নতা ॥

শিখর	বিষ্ণু
১) ৬ | ৬ | ২ | ৩ করে চারটি বিভাগ।	১) ২ । ৩ | ৪ | ৪ | ৪ করে পাঁচটি বিভাগ।
২) তিনটি তালি এবং একটি খালি।	২) চারটি তালি এবং একটি খালি।
৩) ৩য় বিভাগের ত্রয়োদশ মাত্রায় খালি।	৩) ৫ম বিভাগের চতুর্দশ মাত্রায় খালি।
৪) মতান্তরে ৫ | ৬ | ২ | ৪ করে চারটি অথবা ৪ । ৪ | ৩ | ২ | ৪ করে পাঁচটি বিভাগ।	৪) মতান্তরে ৪।২।৪।২।২।৩ করে ছয়টি বিভাগ।
৫) ৭ম এবং ১৫শ মাত্রায় ২য় ও ৩য় তালি।	৫) ৩য় ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় ২য় ও ৩য় তালি।

(১০) মত্ত—লক্ষ্মী

সমতা : (১) মাত্রাসংখ্যা—১৮; (২) ১, ৫, ৭, ১১, ১৩ ও ১৫ মাত্রায় তালি আছে। (৩) বিভাগ নিয়ে মতান্তর আছে (৪) মতান্তরে খালি নেই এবং (৫) উভয়েই অপ্রচলিত তাল।

। বিভিন্নতা ।

মত্ত	লক্ষ্মী
১) নয়টি বিভাগ।	১) পনেরোটি বিভাগ।
২) ছয়টি তালি এবং তিনটি খালি।	২) ১৫টি তালি; খালি নেই।
৩) প্রতি বিভাগেই দুইটি করে মাত্রা।	৩) কেবলমাত্র ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং পঞ্চদশ বিভাগে দুইটি করে মাত্রা।
৪) মাত্রাসংখ্যা নিয়ে মতভেদ নেই।	৪) মাত্রাসংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে; অর্থাৎ মতান্তরে মাত্রা-সংখ্যা ৩৬।
৫) মতান্তরে খালি নেই।	৫) মতান্তরে ১৮টি বিভাগে ১৫টি তালি এবং ৩টি খালি।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংগীতের পারিভাষিক শব্দাবলী ও গীতের প্রকার

স্বর: "স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"।—সংগীত দর্পণ। অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত নাদই স্বর বলে কথিত হয়। 'সংগীত তরঙ্গ'-কারও বলেছেন "নাদ হইতে নির্গত হইল সাত স্বর।" 'সংগীত রত্নাকর'-কার স্বরের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"শ্রুত্যন্তর ভাবী যঃ স্নিগ্ধোহনুরণনাত্মকঃ।
স্বতোরঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে।"

শ্রুতির পরই অবিরাম গতিবিশিষ্ট মধুর এবং সুরেলা ধ্বনি, যা স্নিগ্ধ গুঞ্জন-যুক্ত এবং যা স্বতঃ অর্থাৎ নিজ হতেই অন্য কোনও বস্তুবিশেষের বিনা সাহায্যে শ্রোতৃচিত্ত রঞ্জন করে তাকেই স্বর বলা হয়।

স্বরের প্রকার: সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর নিয়ে স্বরের সংখ্যা মোট ১২টি। সাতটি শুদ্ধ স্বরের নাম ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। সংক্ষেপে এদের বলা হয় সা রে গ ম প ধ নি। পাঁচটি বিকৃত স্বরের মধ্যে রে গ ধ নি স্বর চতুষ্টয় কোমল এবং মধ্যম তীব্র বা কড়ি হয়।

বিকৃত স্বর: শুদ্ধ স্বর হতে কোনও স্বর একটু উঁচু বা নীচু হলেই তাকে বলে বিকৃত স্বর। উপরি উক্ত কোমল স্বরচতুষ্টয় শুদ্ধ রেগধনি হতে নীচু বলেই সেগুলিকে কোমল বলা হয় এবং শুদ্ধ মধ্যম হতে অপর মধ্যমটি উঁচু বলেই সেটিকে বলা হয় তীব্র বা কড়ি মধ্যম। আকারমাত্রিক স্বর-লিপিতে কোমল স্বরগুলিকে লেখা হয় 'ঋাজ্ঞাদাণা' এবং তীব্র মাধ্যমকে লেখা হয় 'হ্মা' এবং ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে লেখা হয় রে̱ গ̱ ধ̱ নি̱ এবং ম॑।

চল এবং অচল স্বর : প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বরগুলিকে চল এবং অচল —এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যে স্বর কোন অবস্থাতেই বিকৃত হয় না অর্থাৎ স্বস্থান হতে বিচ্যুত হয় না তাকে বলে অবিকৃত, প্রাকৃত বা অচল স্বর এবং ১২টি স্বরের মধ্যে ষড়জ ও পঞ্চমকেই এই আখ্যা দেওয়া হয়, কারণ এই দুইটি স্বর কখনোই স্থানভ্রষ্ট হয় না।

শ্রুতি : শ্রু ধাতু + ক্তি প্রত্যয় যোগে শ্রুতি। যা শ্রবণযোগ্য তাকেই বলা হয় শ্রুতি। 'শ্রূয়তে ইতি শ্রুতি'। শ্রুতি হচ্ছে গীতের উপযোগী আওয়াজ যা পরস্পরের পার্থক্যসহ স্পষ্টরূপে শোনা যায়। ভারতীয় সংগীতে ২২টি শ্রুতি মানা হয় এবং ২২টি শ্রুতি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

সপ্তক ও সপ্তকের প্রকার : ষড়জ হতে শুদ্ধ নিষাদ পর্যন্ত স্থানকে বলা হয় একটি সপ্তক, অর্থাৎ এক একটি সপ্তকে আমরা পাই মোট বারটি স্বর। নাদের উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে সপ্তককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: মন্দ্র, মধ্য ও তার। এই তিনটি স্থানকে আবার উদারা, মুদারা এবং তারা বলা হয়ে থাকে। প্রথম সপ্তকটিকে বলা হয় উদারা বা মন্দ্র সপ্তক। এই সপ্তকের স্বরগুলি সবচেয়ে নীচু এবং এগুলি নির্দেশ করা হয় স্বরের নিম্নে বিন্দু (.) চিহ্ন দিয়ে (ভাতখণ্ডে পদ্ধতি) অথবা 'হসন্ত' চিহ্ন দিয়ে (আকারমাত্রিক পদ্ধতি), যেমন : ধ় অথবা ধ্

দ্বিতীয় সপ্তকটির নাম মুদারা বা মধ্য সপ্তক। এই সপ্তকটি মন্দ্র সপ্তক থেকে উঁচু এবং এর স্বরগুলির ক্ষেত্রে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। তৃতীয় সপ্তকটিকে বলা হয় 'তারা' বা তার সপ্তক। মধ্য সপ্তক থেকে এই সপ্তকটি আরও উঁচু এবং ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে এই সপ্তকের স্বর নির্দেশ করা হয় স্বরের উপর বিন্দু চিহ্ন দিয়ে (যেমন : রেং) এবং আকারমাত্রিকে স্বরের উপর 'রেফ' চিহ্ন দেওয়া হয় (যেমন : র্রে)।

আরোহ—অবরোহ : (অনুলোম— বিলোম) : স্বরগুলি ক্রমান্বয়ে ঊর্ধাভিমুখী হলে বলা হয় আরোহ বা অনুলোম, যেমন : সারে গমপধ

নিসা এবং নিম্নাভিমুখী হলে বলা হয় অবরোহ বা বিলোম, যেমন : সা নি ধ প ম গ রে সা।

ধ্বনি বা নাদ : সংগীতোপযোগী মধুর স্বর যা স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলনের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় ধ্বনি বা নাদ। এই নাদ থেকেই সংগীতের উদ্ভব হয়েছে। 'নারদ সংগীতে' আছে "ন নাদেন বিনা গীতং, ন নাদেন বিনা স্বর।"

ধ্বনি বা নাদের প্রকার : নাদের দুইটি প্রকার আছে—অনাহত ও আহত। অনাহত নাদ বা ধ্বনি শ্রুতিগোচর নয়, আহত নাদই শ্রুতিগোচর এবং এইটিই সংগীতের উৎস। আহত নাদের আবার দুইটি উপবিভাগ আছে : ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক নাদ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি অর্থযুক্ত এবং অপরটি অর্থহীন। মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে আঘাতজনিত শব্দ বা বোলকে অর্থযুক্ত এবং আঘাত বা পতনজনিত শব্দকে অর্থহীন ধ্বনি বলা হয়।

বর্ণাত্মক : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমন্বিত ধ্বনিকেই বলা হয় বর্ণাত্মক নাদ। বর্ণাত্মক নাদ সম্বন্ধে সংগীত তরঙ্গ-কারের একটি সুন্দর উক্তি—

বর্ণাত্মক শব্দ যারা নিরাকার হয় তারা,
প্রতিমূর্তি পঞ্চাশ প্রকার।
অ—ক আদি বর্ণগণ, স্বরে হ'লে বিশেষণ,
সকল শাস্ত্রের মূলাধার॥

কম্পন বা আন্দোলন : কোন একটি স্বরকে অনুরণিত করাকেই বলা হয় কম্পন বা আন্দোলন। স্বরের আন্দোলনের উপর নির্ভর করে স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতা। আন্দোলনের চারটি প্রকারভেদ আছে যেমন : স্থির, অস্থির, নিয়মিত ও অনিয়মিত আন্দোলন।

ক) স্থির আন্দোলন : কিছু সময় স্থায়ী যে আন্দোলন তাকে বলা হয় স্থির আন্দোলন।

খ) অস্থির আন্দোলন : প্রারম্ভেই যে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় তাকে বলা হয় অস্থির আন্দোলন।

গ) নিয়মিত আন্দোলন : সমান গতিবেগসম্পন্ন আন্দোলন অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে যে আন্দোলনের সংখ্যা সমান থাকে তাকে বলা হয় নিয়মিত আন্দোলন।

ঘ) অনিয়মিত আন্দোলন : অসমান গতিবেগসম্পন্ন আন্দোলনকে বলা হয় অনিয়মিত আন্দোলন।

ঠাট : সাতটি স্বরের ক্রমিক রচনাকে বলা হয় ঠাট, থাট বা মেল। ঠাটের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ্য এই যে প্রথমতঃ, এতে অবরোহের প্রয়োজন হয় না; দ্বিতীয়তঃ, একই স্বরের দুইটি রূপ (কোমল ও তীব্র) পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় না, তৃতীয়তঃ, ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন রাগের নামানুসারে ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে এবং ঠাটের সংখ্যা দশটি। এই দশটি ঠাটের নাম স্বরসহ উল্লেখ করা হল।

১) কল্যাণ : সা রে গ ম প ধ নি ২) বিলাবল : সা রে গ ম প ধ নি

৩) খাম্বাজ : সা রে গ ম প ধ নি ৪) ভৈরব : সা রে গ ম প ধ নি

৫) পূর্বী : সা রে গ ম প ধ নি ৬) মারোয়া : সা রে গ ম প ধ নি

৭) কাফী : সা রে গ ম প ধ নি ৮) আশাবরী : সা রে গ ম প ধ নি

৯) ভৈরবী : সা রে গ ম প ধ নি ১০) তোড়ী : সা রে গ ম প ধ নি

রাগ : "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ।"—যে স্বর রচনা মনুষ্যের চিত্তরঞ্জন করে তাকেই বলা হয় রাগ। রাগের কয়েকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল : (ক) রাগ রচনায় ন্যূনতম পাঁচটি স্বর ব্যবহার করতেই হবে; (খ) কোন রাগেই ষড়জ স্বর বর্জিত হবে না, (গ) রাগে সাধারণতঃ একই স্বরের দুটি রূপ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় না; (ঘ) রাগে মধ্যম এবং পঞ্চম স্বর একত্রে বর্জিত হবে না; (ঙ) রাগে আরোহ-অবরোহ, বাদী-সম্বাদী স্বর, সময়, ঠাট,

জাতি ইত্যাদির নির্দেশ থাকবে এবং (চ) বাদী হতে সম্বাদী স্বরের দূরত্ব কমপক্ষে সাত শ্রুতি থাকবে।

রাগের জাতি : রাগের আরোহ—অবরোহে ব্যবহৃত স্বরসংখ্যা দ্বারা রাগের জাতি নির্ধারিত হয়। কারণ একটি রাগের আরোহে বা অবরোহে ৫টি, ৬টি বা ৭টি স্বর ব্যবহৃত হতে পারে। রাগের মুখ্য তিনটি জাতি : ওড়ব বা ঔড়ব (৫টি স্বরের প্রয়োগ হলে), ষাড়ব বা খাড়ব (৬টি স্বরের প্রয়োগ হলে) এবং সম্পূর্ণ (৭টি স্বরের প্রয়োগ হলে)। তবে এই তিনটি জাতির আরোহ অবরোহের স্বরসংখ্যা মিলিয়ে মিশিয়ে নিম্নলিখিত মোট নয়টি জাতি পাওয়া যায়, যথা :—

সংখ্যা	জাতির নাম	আরোহে স্বরসংখ্যা	অবরোহে স্বরসংখ্যা
১।	সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ	৭	৭
২।	সম্পূর্ণ—ষাড়ব	৭	৬
৩।	সম্পূর্ণ—ঔড়ব	৭	৫
৪।	ষাড়ব—সম্পূর্ণ	৬	৭
৫।	ষাড়ব—ষাড়ব	৬	৬
৬।	ষাড়ব—ঔড়ব	৬	৫
৭।	ঔড়ব—সম্পূর্ণ	৫	৭
৮।	ঔড়ব—ষাড়ব	৫	৬
৯।	ঔড়ব—ঔড়ব	৫	৫

বর্ণ : "গান ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ…।" গানের ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়; অর্থাৎ বর্ণ বলতে বোঝায় সংগীতে স্বরের বিশিষ্ট প্রয়োগ। বর্ণ চার প্রকার : স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী।

ক) স্থায়ী বর্ণ : একটি স্বরের একাধিক প্রয়োগকে বলা হয় স্থায়ী বর্ণ. যেমন সা সা রে রে গ গ ইত্যাদি।

খ) আরোহী বর্ণ : নিম্ন হতে ক্রম-উর্ধাভিমুখী স্বরের ক্রিয়াকে বলা হয় আরোহী বর্ণ; যেমন : সা রে গ ম প ধ নি ইত্যাদি।

গ) অবরোহী বর্ণ: ঊর্ধ হতে ক্রম-নিম্নাভিমুখী স্বরের ক্রিয়াকে বলা হয় অবরোহী বর্ণ: যেমন, নি ধ প ম গ রে সা।

ঘ) সঞ্চারী বর্ণ: উপর্যুক্ত তিন বর্ণের মিশ্রণজাত স্বরপ্রয়োগ ক্রিয়াকে বলা হয় সঞ্চারী বর্ণ, যেমন: সা সা সা রে রে রে গ ম প ধ প ম গ রে সা ইত্যাদি।

আলাপ: রাগ গায়নের ভূমিকাকে বলা যায় আলাপ। বিশেষ একটি রাগের গান আরম্ভ করবার পূর্বে 'আ-কার' বা 'নোম্ তোম্' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্বর বিস্তার করে গায়ক যে রাগটি পরিবেশন করতে চান তার সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ করেন এবং এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় আলাপ।

স্বরবিস্তার: রাগ গায়নের সময় বিশেষ রাগটিকে স্পষ্টীকরণ করবার জন্য 'আ-কার' বা গীতের বাণীর সাহায্যে আলাপের অনুরূপ ক্রিয়াকে স্বরবিস্তার বলা হয়।

জোড়: বাদ্যযন্ত্রাদিতে আলাপ অংশে ব্যবহৃত তালকে জোড় বলা হয়।

ঝালা: বাদ্যযন্ত্রাদিতে ঝালা বা ঝংকার অন্যতম একটি অলংকার। নায়কী বা নায়কীর পার্শ্ববর্তী তারে সুর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চিকারী বা তার পার্শ্ববর্তী তারে নানা ছন্দে এবং লয়ে আঘাত করে যে সুরমণ্ডল সৃষ্টি করা হয় তাকেই বলে ঝালা, ঝংকার বা ছেড়।

তান: 'তন্' ধাতুর অর্থ হচ্ছে বিস্তার। স্বরবর্ণ সহযোগে স্বরের দ্রুত আরোহন অবরোহনকে বলা হয় তান, তোড়া বা উপজ। তানের আবার নানা প্রকারভেদ আছে, যেমন: শুদ্ধ, মিশ্র, কূট, খট্কা, ঝট্কা, বক্র, সরোক, অচরোক, সপাট, লড়ন্ত, গিটকিরী, হলক, বোলতান ইত্যাদি।

অতাই: গুরুকরণ করে নিয়মিত সংগীত শিক্ষার পথে না গিয়ে যিনি অন্য উপায়ে অর্থাৎ কেবলমাত্র শুনে শুনেই সংগীত শিক্ষা করেন এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিকেই বলা হয় অতাই বা অতাই গায়ক।

তন্ত্রবাদনের গৎ ও তার প্রকার—(মজিদখানি—রজাখানি) : তন্ত্রবাদনে বিভিন্ন বাজের মধ্যে দুইটি বাজ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে : মজিদখানি এবং রজাখানি বা গুলামরেজা বাজ। প্রথমোক্ত বাজের গৎ সাধারণতঃ ত্রিতালে বাদিত হয় এবং এর নিম্নলিখিত বিশেষ একটা ছক আছে, যেমন : ডেরে । ডা ডেরে ডা রা | ডা ডা রা ডেরে | ডা ডেরে ডা রা। ডা ডা রা
৩ × ২ ০
তানসেন বংশীয় ফিরোজ খাঁর পুত্র মজিদ খাঁসাহেবের নামানুসারেই এই বাজটির নামকরণ হয়েছে মজিদখানি বাজ।

দ্বিতীয় বাজটি বিহার প্রদেশের পাটনা নিবাসী তানসেন বংশীয় অথবা তাদের শিষ্যবংশীয় জনৈক গুলামরেজা কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং তার নামানুসারেই রজাখানি বা গুলামরেজা বাজ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এই বাজটি আবার পূর্বী বা পুরবথা বাজ নামেও পরিচিত। রজাখানি বাজের গৎ সাধারণতঃ দ্রুত ত্রিতালেই বাদিত হয় এবং এতে বোল বা বাণীর নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

গীতের প্রকার

ধ্রুপদ : ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক বিশেষ সম্পদ। ধ্রুপদ গানকে এক প্রকার আধ্যাত্মিক সংগীত বলা চলে, কারণ প্রতিটি গানই আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত ঈশ্বর ভজনামূলক রচনা, যেন গানের মধ্য দিয়ে শিল্পী ঈশ্বরের উপাসনা করছেন।

ধ্রুপদ গানে সাধারণতঃ চারটি তুক্ বা ভাগ থাকে, যথা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। তবে কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি তুক্ সমন্বিত ধ্রুপদেরও অভাব নেই। প্রতিটি বিভাগে থাকে তিন কিংবা চারটি চরণ। এই গানের সঙ্গে পাখোয়াজ দ্বারা সংগত করা হয় এবং প্রধানতঃ চৌতাল, ব্রহ্মতাল, সুরফাঁকতাল, রুদ্রতাল ইত্যাদি তালে ধ্রুপদ গাওয়া হয়।

ধামার : হোলীর বর্ণনা সমন্বিত যে গান 'ধামার' তালে নিবদ্ধ তাকে বলা হয় হোরী বা ধামার গান। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাই হোলীর বিষয়বস্তু। এই গানে হিন্দী ও ব্রজভাষায় প্রাধান্য।

খেয়াল : নানাবিধ তান, বিস্তার ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন তালে রাগ গায়নকে বলা হয় খেয়াল। খেয়ালের দুইটি প্রকার : বড় বা বিলম্বিত খেয়াল (Slow Kheyal) এবং ছোট বা দ্রুত খেয়াল (Fast Kheyal)। প্রথমেই বড় বা বিলম্বিত খেয়াল আরম্ভ করা হয় অত্যন্ত ঢিমা লয়ে অর্থাৎ বিলম্বিত একতাল, ঝুমরা, তিলোয়াড়া ইত্যাদি তালে এবং এরপর ছোট বা দ্রুত খেয়াল আরম্ভ করা হয় মধ্যলয়ে। ছোট খেয়ালের শেষ পর্যায়ে লয়কে আরও দ্রুত করে বিভিন্ন সরল ও আলংকারিক তান প্রয়োগ করা হয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলতান, সরগম্ ইত্যাদি প্রয়োগ করে গানের যবনিকা টানা হয়।

ঠুংরী : প্রেম বা বিরহ বিষয়ক রচনা সমন্বিত শৃঙ্গার রস ও ভাবপ্রধান বিশেষ এক শ্রেণীর গানকে বলা হয় ঠুংরী। ঠুংরীতে রাগের কঠিন নিয়ম-কানুনের বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়, কারণ রাগের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা ভাবের প্রতি এখানে মনোযোগ দেওয়া হয় বেশী। তাই ঠুংরী গানে রাগমিশ্রণও ঘটে থাকে। প্রধানতঃ বিশেষ কয়েকটি রাগে এবং তালে ঠুংরী গাওয়া হয়ে থাকে, যেমন : রাগের মধ্যে কাফী, খাম্বাজ, তিলং, ভৈরবী, পিলু, তিলককামোদ ইত্যাদি এবং তালের মধ্যে যৎ, আদ্ধা, ত্রিতাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

টপ্পা : গোলাম নবী ওরফে শোরী মিঞা নামে একজন পাঞ্জাবীকে টপ্পা গানের উদ্ভাবক বলে অনেকে মনে করেন। টপ্পা গানে বাণী নিতান্তই অল্প এবং এর প্রকৃতি চঞ্চল ও শৃঙ্গার রসপ্রধান। এই গানে পাঞ্জাবী ভাষার প্রাধান্য ; তবে বাংলা ভাষাতেও অজস্র টপ্পা রচিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে টপ্পার প্রচলন এবং জনপ্রিয় করবার মূলে যিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তার নাম রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু। টপ্পার গায়কী একবারে ভিন্ন জাতের, কারণ এতে দানাদার বোলতানের আধিক্যই প্রধান। চঞ্চল প্রকৃতির জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়, যেমন : কাফী, খাম্বাজ, পীলু, ভৈরবী ইত্যাদি এবং একাধিক তালে টপ্পা গাওয়া হলেও 'টপ্পা তাল' নামে এই গানের জন্য ১৬ মাত্রার বিশেষ একটি তাল আছে।

তারাণা : খেয়াল গানের মত যে গান 'না, দির, তোম্, তানা, দেরে' ইত্যাদি অর্থহীন বোলসহযোগে গাওয়া হয় তাকে বলা হয় তারাণা।

তারাণার বাণীর মধ্যে কখনও তবলা ও পাখোয়াজের বোলও অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এর দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। অত্যন্ত দ্রুত লয়ে এই গান গাওয়া হয় এবং লয়কারীর চমৎকারিত্বে তারাণা শ্রোতার চিত্ত জয় করে।

ত্রিবট : তারাণার মত করেই ত্রিবট গাওয়া হয়ে থাকে। ত্রিবটের বাণীতে পাখোয়াজের বোলের প্রাধান্য থাকে। বর্তমানে ত্রিবট গান অপ্রচলিত।

চতুরঙ্গ : খেয়াল, তারাণা. সর্‌গম্ এবং ত্রিবট—এই চারটি অঙ্গ মিশ্রিত করে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলা হয় চতুরঙ্গ। চতুরঙ্গের অর্থ হচ্ছে চারটি অঙ্গ অর্থাৎ গানের বাণী, তারাণার বোল, সর্‌গম্ এবং পাখোয়াজের বোল নিয়েই এর অবয়ব গঠিত। খেয়াল গানের ঢঙে চতুরঙ্গ গাওয়া হয়ে থাকে।

লহরার গৎ : তবলায় কোন বিশেষ তালে লহরা বাজাবার জন্য সেই তালে নিবদ্ধ কোনও গৎ হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রে বাজাবার প্রয়োজন হয়। যে কোনও রাগাশ্রয়ী গতেরই একটি মাত্র আবর্তন বাজান চলতে পারে। তবে সাধারণতঃ চন্দ্রকোষ রাগের গৎই বাজান হয়ে থাকে। নিম্নে ত্রিতাল, ঝুমরা, একতাল এবং ঝাঁপতালে চন্দ্রকোষ রাগের প্রচলিত গৎগুলি দেওয়া হ'ল।

চন্দ্রকোষ রাগে গ এবং ধ কোমল, অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

ত্রিতাল—সা — সা সা | নি ধ নি সা | নি ধ ম গসা | গ ম ধ নি
× ২ ০ ৩

ঝুমরা - সা — সা | নি ধ নি সা | নি ধ ম | গ ম ধ নি
× ২ ০ ৩

একতাল—সা — | নি ধ | নি সা | নি ধম | গ ম | ধ নি
× ০ ২ ০ ৩ ৪

ঝাঁপতাল—সা নি | ধ নি সা | নি ধ | ম ধ নি
× ২ ০ ৩

১৯৭৮ সাল থেকে প্রচলিত প্রয়াগ সংগীত সমিতির তবলা ও মৃদঙ্গের (পাখোয়াজ) ১ম হতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় অংশের পাঠক্রম

॥ প্রথম বর্ষ ॥

১। তবলা অথবা মৃদঙ্গের বর্ণের জ্ঞান।

২। তবলা অথবা মৃদঙ্গের পাঠক্রমভুক্ত তালগুলির (ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, চৌতাল, দাদরা) ঠেকার পূর্ণ পরিচয় এবং এইগুলির ঠায় ও দুগুণ লয়ে মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি (ভরী), খালি (ফাঁক) ইত্যাদি ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতিতে লিখন। টুকড়া, পরণ, মোহরা ইত্যাদি তাললিপিতে লিখন।

৩। পরিভাষা: তাল, মাত্রা, লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), বিভাগ, সম, তালি (ভরী), খালি (ফাঁক)। আবর্তন, ঠায়, দুগুণ, চৌগুণ, ঠেকা, বোল, কায়দা, পাল্টা, তিহাই, মোহরা মুখড়া, কিস্‌মে, টুকড়া।

৪। তবলা অথবা মৃদঙ্গের জ্ঞান এবং উহার বর্ণনা।

৫। তবলা তথা মৃদঙ্গের উৎপত্তির সাধারণ জ্ঞান।

৬। ভাতখণ্ডে বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞান।

॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥

১। ১ম ও ২য় বর্ষের তালগুলি (রূপক, সুলতাল, তীব্রা, দীপচন্দী, কাহারবা এবং তিলোয়াড়া) ঠায়, দুগুণ ও চৌগুণ লয়ে এবং টুকড়া তাল-লিপিতে লিখন।

২। পরিভাষা এবং ব্যাখ্যা: ধ্বনি, ধ্বনির প্রকার, ধ্বনির উৎপত্তি, কম্পন, আন্দোলন, নাদ, রেলা, পরণ, উঠান, সংগত, স্বতন্ত্র বাদন (শৈলী)।

৩। বিষ্ণুদিগম্বর তথা ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞান।

৪। বর্তমান কালের কোন প্রসিদ্ধ তবলা বা মৃদঙ্গ বাদকের জীবনী।

৫। সংগীতে তবলা অথবা মৃদঙ্গের মহত্ব।

॥ তৃতীয় বর্ষ ॥

১। সকল তালের (আড়াচৌতাল, ধামার ধুমালী, ঝুম্‌রা, ষৎ) ঠেকায় দুগুণ, তিনগুণ এবং চৌগুণ লয়কারী তাললিপিতে লিখন এবং এর পরণ, টুকড়া ইত্যাদি তাললিপিতে লিখবার জ্ঞান।

২। পরিভাষা : সংগীত, গৎ, আড়, বাঁট, মৃদঙ্গের অঙ্গের জ্ঞান (ময়দার উদ্দেশ্য), তবলা ও মৃদঙ্গের তুলনা, বিস্তারিত ইতিহাস এবং মিলাবার বিধি। তবলার বিভিন্ন বাজ। জাতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন তথা তিশ্র, চতশ্র, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ জাতির পরিভাষা। শ্রুতি, স্বরের প্রকার (চল, অচল, শুদ্ধ, বিকৃত) সপ্তক, সপ্তকের প্রকার (মন্দ্র, মধ্য, তার,) আরোহ ও অবরোহ।

৩। মৃদঙ্গের পরীক্ষার্থীর তবলার অঙ্গ ও বর্ণের জ্ঞান এবং তবলার পরীক্ষার্থীর মৃদঙ্গের অঙ্গ ও বর্ণের জ্ঞান।

৪। তবলা এবং মৃদঙ্গ বাদকের শাস্ত্রে বর্ণিত গুণ ও দোষের অধ্যয়ন।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। পুর্ববর্তী এবং এই বর্ষের তালাদির (পঞ্চম সওয়ারী, টপ্পা, আদ্ধা, পাঞ্জাবী, গজঝম্পা, মত্ততাল) দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুআড় ইত্যাদি তাললিপিতে লিখনের জ্ঞান। বিভিন্ন প্রকারের কায়দা, টুকড়া, পরণ ইত্যাদি ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপিতে লিখন।

২। বিষ্ণুদিগম্বর এবং ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতির সূক্ষ্ম তথা তুলনাত্মক অধ্যয়ন এবং এর গুণ ও দোষ।

৩। পুর্ববর্তী বর্ষের সকল পারিভাষিক শব্দের বিস্তারিত অধ্যয়ন এবং তার ক্রিয়াত্মক মহত্ব। পেশকার, সাথসংগত, লগ্‌গী, লড়ী, ফরমাইশী চক্রদার টুকড়া তথা পরণ, গৎ, কায়দা, তিপল্লী, চৌপল্লী, চলন (চালা)।

৪। গণিত দ্বারা বিভিন্ন তালের দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুআড় ইত্যাদি আয়ত্ত করবার স্থান নির্ণয় এবং তাললিপিতে লিখন।

৫। সমান মাত্রাসংখ্যাসম্পন্ন তালের মধ্যে তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৬। প্রবন্ধ: সংগীতে তালের মহত্ত্ব; সংগতের মহত্ত্ব; সংগীতে লয় তথা তালের স্থান; তবলা সংগতের উদ্দেশ্য ও বিধি, লয় এবং লয়কারী, সাথ এবং সংগত।

৭। তালের দশ প্রাণ এবং ভারতীয় সংগীতে তার মহত্ত্ব।

৮। মোদু খাঁ, বখ্‌শু খাঁ, নখ্‌খু খাঁ, আবিদ হুসেন এবং রামসহায়ের জীবনী এবং তবলা-বাদন ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান তথা কার্য।

৯। পরিভাষা: বর্ণ (স্বর সম্বন্ধীয়) ঠাট (প্রচলিত ১০টি ঠাটের নাম ও তার স্বর), রাগ, রাগ-জাতি (ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ)।

॥ পঞ্চম বর্ষ ॥

১। পাঠক্রমের সকল তালের ঠেকা (এই বর্ষের তাল:—শিখর, ব্রহ্ম, রুদ্র ও লক্ষ্মী) সকল প্রকার লয়কারীতে লিখন। টুকড়া, পরণ ইত্যাদি তাললিপিতে লিখনের পূর্ণজ্ঞান।

২। বিভিন্ন মাত্রা থেকে নতুন টুকরা ইত্যাদি গঠন এবং গণিত দ্বারা বিভিন্ন লয়কারীর প্রারম্ভিক স্থান নির্ণয়ের জ্ঞান।

৩। পরিভাষা: কুআড়, বিআড়, ফরমাইশী বন্দিশ (রচনা), লোম-বিলোম, সওয়াগুণ, পৌনেগুণ ইত্যাদি। দক্ষিণী (কর্ণাটকী) তাল এবং তাল-পদ্ধতির অধ্যয়ন। বিভিন্ন ভারতীয় অবনদ্ধ বাদ্য এবং তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবলা এবং মৃদঙ্গের তুলনাত্মক অধ্যয়ন এবং ইতিহাস।

৪। তান, আলাপ, জোড়, ঝালা, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, তন্ত্রবাদনের গৎ ও তার প্রকার (মজিদখানি, রজাখানি) ইত্যাদির ব্যাখ্যা।

৫। সমপদী এবং বিষমপদী তালের তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৬। প্রচলিত তাললিপির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৭। সমান মাত্রার তালের মধ্যে তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৮। লয়, তাল, অবনদ্ধ বাদ্য এবং অন্যান্য সংগীত-সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা।

॥ ষষ্ঠ বর্ষ ॥

॥ প্রথম প্রশ্নপত্র ॥

১। পুরব এবং পশ্চিমী বাজের বিভিন্ন ঘরাণার বাদনশৈলীর তুলনাত্মক অধ্যয়ন। কোদউ সিংহ, খব্বে হুসেন, নানা পানসে এবং পর্বত সিংহের বাদন-শৈলীর সূক্ষ্ম অধ্যয়ন। পাখোয়াজ এবং তবলার বোলের পার্থক্য। একক (Solo) ও সাথ বাজের মধ্যে পার্থক্য এবং এই দুই বিধির বিস্তারিত বর্ণনা। সংগত করবার কলা। অবনদ্ধ বাদ্যের উন্নতির পথ। প্রসিদ্ধ তবলা বাদক এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য। স্বর এবং লয়ের সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য সংগীতে তালের স্থান এবং সাধন। তাললিপিতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। পাশ্চাত্য তাল-পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞান।

২। ১ম বর্ষ হতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত সকল পারিভাষিক শব্দ তথা বিষয়ের বিস্তারিত এবং তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৩। ১ম বর্ষ হতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত অপ্রচলিত তালের অধ্যয়ন এবং সেগুলিকে প্রচলিত করবার উপায়।

৪। ছন্দ তথা পিংগল শাস্ত্রের জ্ঞান।

৫। পরিভাষা: স্বরবিস্তার, বোল, বাঁট, চতুরঙ্গ, তারাণা এবং ত্রিবট।

৬। প্রসিদ্ধ তবলা অথবা মৃদঙ্গ-বাদকের পরিচয় এবং তাঁদের বাদন শৈলীর আলোচনাত্মক অধ্যয়ন।

৭। তাল, লয় তথা সংগীত-সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর রচনার ক্ষমতা।

॥ দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র (ক্রিয়াত্মক সম্বন্ধীয়) ॥

১। পূর্ববর্তী বর্ষ সমূহের সকল তাল এবং তার সবকিছু ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপিতে লিখনের পূর্ণজ্ঞান। (এই বর্ষের তাল : কৈদ-ফরোদস্ত, কুম্ভ, বসন্ত, ১৬ মাত্রার সওয়ারী)।

২। পাঠক্রমের সকল তালের তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৩। তালগুলি বিভিন্ন লয়কারীতে লিখনের পূর্ণজ্ঞান।

৪। দক্ষিণী এবং উত্তর ভারতীয় তালপদ্ধতির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৫। পাশ্চাত্য ষ্টাফ-লিপির জ্ঞান।

৬। বিভিন্ন প্রকার সংগীতের সঙ্গে উপযুক্ত অবনদ্ধ বাদ্যের দ্বারা সংগতের জ্ঞান।

১৯৭৯ সাল থেকে প্রবর্তিত প্রাচীন কলাকেন্দ্রের তবলা ও পাখোয়াজের প্রারম্ভিক হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত তত্ত্ববিষয়ক অংশের পাঠক্রম

॥ প্রারম্ভিক—প্রথম খণ্ড (মৌখিক) ॥

১। পরিভাষা : ঠেকা, তাল, লয়, সম, তালি, খালি, আবর্তন ও বিভাগ।

২। পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত তালসমূহ মাত্রা ও বিভাগের সাহায্যে নিরূপণ করিবার অভ্যাস।

৩। পাঠক্রমে নির্ধারিত তালসমূহের (ত্রিতাল ও কাহারবা) ঠেকা তালি খালি দেখাইয়া ঠায় লয়ে বলিবার অভ্যাস।

॥ প্রারম্ভিক—পূর্ণ (মৌখিক) ॥

১। পরিভাষা : ঠেকা, বোল, দ্বিগুণলয়, চৌগুণলয়; লহরা, তেহাই, কানি, সুর, গাব।

২। পাঠক্রমের নির্ধারিত তালসমূহ : মাত্রা ও বিভাগের সাহায্যে নিরূপণ করিবার অভ্যাস।

৩। পাঠক্রমের নির্ধারিত তালসমূহের (দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল ও ঝাঁপতাল) ঠেকা তালি খালি দেখাইয়া বলিবার অভ্যাস।

॥ প্রথম বর্ষ (সংগীতভূষণ—১ম খণ্ড) ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের জ্ঞান :—

লয় ও উহার তিন প্রকার (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), মাত্রা; তাল, বিভাগ, সম, তালি, খালি, আবর্তন, ঠেকা, ঠায়, দ্বিগুণ।

২। তবলার উৎপত্তির সাধারণ জ্ঞান। ডাহিনা ও বাঁয়ার অঙ্গ বর্ণনা।

৩। তবলা ও পাখোয়াজের ডাহিনা ও বাঁয়ার কোন কোন স্থানে আঘাত করিয়া কোন কোন একাক্ষর শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ।

৪। এই বর্ষের নির্ধারিত তালসমূহের (ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, কাহারবা, দাদরা এবং চৌতাল) ঠেকার ঠায় ও দ্বিগুণ লয় লিখিবার অভ্যাস।

॥ দ্বিতীয় বর্ষ (সংগীতভূষণ ২য় খণ্ড) ॥

১। তবলা বা পাখোয়াজের ডাহিনা ও বাঁয়ার কোন কোন স্থানে আঘাত করিয়া কোন কোন সংযুক্ত অক্ষর উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ।

২। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের অধ্যয়ন :—
বোল, কায়দা, পাল্টা, তেহাই ও উহার প্রকার, মোহরা, মুখড়া, টুকড়া, তিনগুণ ও চৌগুণ, রেলা, পেশকার, উঠান এবং পরণ।

৩। ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বরের তাল পদ্ধতির জ্ঞান এবং বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে ঠেকা লিখিবার অভ্যাস।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের নির্ধারিত তালসমূহের (২য় বর্ষের তাল: একতাল, সুরফাঁকতাল, দীপচন্দী, রূপক, তেওড়া এবং তিলোয়াড়া) ঠেকার ঠায়, দ্বিগুন, তিনগুণ ও চৌগুণ লয়কারী লিখিবার অভ্যাস।

৫। জীবনী: আনোখেলাল মিশ্র কণ্ঠে মহারাজ, বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।

॥ তৃতীয় বর্ষ (সংগীতভূষণ, পূর্ণ) ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দগুলির অধ্যয়ন:
রেলা, লগ্‌গী, লড়ী, আড়, গৎ, বাট; চক্রদার পরণ, গ্রহ এবং তার চার প্রকার, পেশকার; তবলার দশবর্ণ, দমদার তিহাই এবং বেদম-দার তিহাই।

২। তাল ও উহার দশ প্রাণ।

৩। সাধারণ গায়ন এবং বাদন শৈলীর জ্ঞান, যেমন ধ্রুপদ, ধামার; ঠুংরী খেয়াল; মসিদখানি এবং রজাখানি।

৪। সমান মাত্রা তালসমূহের তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৫। তবলা ও পাখোয়াজের বিস্তার ও তুলনামূলক অধ্যয়ন

৬। তবলা ও পাখোয়াজ স্বরে মিলাইবার প্রক্রিয়া।

৭। তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ ও দোষ।

৮। ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতির অধ্যয়ন এবং এই দুই পদ্ধতিতে কায়দা, টুকড়া, পরণ, পেশকার ইত্যাদি লিখিবার অভ্যাস।

৯। প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত নির্ধারিত সমস্ত তালের (৩য় বর্ষের তাল: আড়াচারতাল, ধামার, ঝুমরা, পাঞ্জাবী, যৎ, সওয়ারী—১৫ মাত্রা, গজঝম্পা, মত্ত এবং রুদ্রতাল) ঠেকার ঠায়, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ এবং আড় লয়কারী লিখিবার অভ্যাস।

১০। অহমেদজান থিরকুয়া, কেরামতউল্লা খাঁ এবং হীরেন গাঙ্গুলীর বাদক হিসাবে প্রসিদ্ধির কারণ।

১১। সংগীত সম্বন্ধে নিবন্ধ।

॥ চতুর্থ বর্ষ (সংগীত বিশারদ, প্রথম খণ্ড) ॥

১। তবলা এবং পাখোয়াজের বিভিন্ন বাদনভঙ্গীর পূর্ণ অধ্যয়ন।

২। ভারতীয় ঘনবাদ্যের অধ্যয়ন এবং সংগীতে উহাদের অবদান।

৩। কর্ণাটক তাল পদ্ধতির অধ্যয়ন।

৪। ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর তাল পদ্ধতির বিশেষ অধ্যয়ন। উহাদের ত্রুটি এবং সংশোধন সম্পর্কে নিজের মতামত।

৫। ভারতীয় সংগীতে তালের দশ প্রাণ।

৬। প্রথম হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত নির্ধারিত সমস্ত তালের (৪র্থ বর্ষের তাল: রুদ্র, শিখর, বসন্ত, সওয়ারী—১৬ মাত্রা এবং ফরোদস্ত) তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৭। পাঠক্রমে নির্ধারিত সমস্ত তালের পরণ, টুকড়া, পেশকার ইত্যাদি তালপিতে লিখিবার অভ্যাস।

৮। তাল, সঙ্গত এবং লয়কারী সম্বন্ধে রচনা।

৯। নিম্নলিখিত তবলা বাদকদের জীবনী এবং সংগীতে তাঁদের অবদান:— আবিদ হোসেন হবীবুদ্দীন ও আল্লারাখাঁ।

পঞ্চম বর্ষ (সংগীত বিশারদ, পূর্ণ)

॥ প্রথম প্রশ্নপত্র ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের অধ্যয়ন :—
লোম, বিলোম, আড়, বিআড়, দুপল্লী; তিপল্লী অনাঘাত, সম, বিষম, ফরমাইসী পরণ, দ্রুত, অনুদ্রুত এবং অতাই।

২। উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতির পূর্ণ অধ্যয়ন এবং উহাদের তুলনামূলক আলোচনা।

৩। তবলা ও পাখোয়াজের পূর্ণ ইতিহাস।

৪। তবলা ও পাখোয়াজের বাদনশৈলীর পার্থক্য।

৫ ভারতীয় ঘনবাদ্য ও উহার প্রয়োগ।

৬। তবলার বিভিন্ন ঘরাণার জন্ম ও বিকাশের কারণ।

৭। দিল্লী, পাঞ্জাব ও লক্ষ্মৌ ঘরাণার বাদনশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

॥ দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

১। পাঠক্রমের নির্ধারিত তালসমূহের (৫ম বর্ষের তাল : ব্রহ্ম, কুম্ভ, পস্তো লক্ষ্মী ও শিখর) ঠেকা বিভিন্ন লয়কারীতে লিখিবার অভ্যাস।

২। কঠিন পেশকার, কায়দা, পরণ, টুকড়া ইত্যাদি ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণু-দিগম্বর পদ্ধতিতে লিখিবার অভ্যাস।

৩। কর্ণাটক ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে নির্ধারিত তালগুলির ঠেকা লিখিবার অভ্যাস।

৪। পাঠক্রমের নির্ধারিত সমস্ত তালের তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৫। সংগীত সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা।

৬। জীবনী ও কলাক্ষেত্রে অবদান :—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কিষেণ মহারাজ ও সামতাপ্রসাদ।

ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠের তবলা এবং মৃদঙ্গের শাস্ত্রীয় পাঠ্যক্রম

[১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ]

॥ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ ॥

প্রথমাংশ – যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

(১) তবলা বাঁয়া এবং মৃদঙ্গের বর্ণনা।

(২) বর্ণ উৎপাদন বিধি। তবলা বাঁয়া এবং মৃদঙ্গের উভয়দিকে তাল, অক্ষর, পাঠাক্ষর এবং প্রত্যেকটি বর্ণের স্থায়িত্বের বর্ণনা।

(৩) বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয়াংশ—তাল-বৈশিষ্ট্য।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা :—

তাল, লয়, মাত্রা, সম, খালি, ভরী, তিহাই, কলা, ক্রিয়া, অঙ্গ, বিলম্বিত লয়, মধ্যলয়, এবং দ্রুতলয়, দুগুণ, চৌগুণ, আটগুণ।

(২) পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত তালগুলির (দাদরা, ঝাঁপতাল, একতাল ত্রিতাল, আড়া চৌতাল, তিলোয়াড়া পাঞ্জাবী, ঝুম্‌রা, কাহারবা) ঠেকা, মাত্রাবিভাগ।

(৩) পাঠ্যক্রমের তালগুলির তাললিপি।

॥ তৃতীয় বর্ষ (মধ্যমা) ॥

প্রথমাংশ—যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :—

(১) তবলা এবং মৃদঙ্গে স্বর বাঁধা।

(২) তবলা, বাঁয়া এবং মৃদঙ্গে একক অথবা সমষ্টিগতভাবে ছোট ছোট বর্ণসমষ্টির প্রয়োগ।

(৩) দক্ষিণ এবং বামহস্তের অঙ্গুলীচালন কৌশল।

দ্বিতীয়াংশ—তাল বৈশিষ্ট্য।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা—চতুর্বিধ গ্রহ, তিন প্রকার জাতি, লয়, তিন প্রকার কলা, মুখড়া, পরণ, লগ্‌গী, রেলা-লড়ী; বোল, কায়দা।

(২) তবলা ও মৃদঙ্গবাদকের গুণ ও দোষ।

(৩) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূর্ক্ত তালগুলির (সওয়ারী, গজঝম্পা, মত্ততাল) ঠেকা ও মাত্রাবিভাগ

(৪) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূর্ক্ত তালগুলির তাললিপি।

(৫) দ্বিগুণ, চৌগুণ, তিনগুণের অর্থ এবং এই লয়কারীতে বিভিন্ন তাল লিখনের পদ্ধতি।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ

॥ বাদ্য বিশারদ (B.MUS) ॥

প্রথমাংশ (যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য) :—

(১) তবলা ও মৃদঙ্গের ইতিহাস।

(২) তবলা ও মৃদঙ্গের বিভিন্ন ঘরাণা ও বাজ।

(৩) সাথ-সংগতে স্বাধীনভাবে ঠেকা, গৎ, পরণ ইত্যাদি রচনা।

(৪) নিম্নলিখিতগুলিব সঙ্গে তবলা ও মৃদঙ্গ সংগত :—

(ক) কণ্ঠসংগীত

(খ) যন্ত্রসংগীত

(গ) নৃত্য

(৫) তাল, ছন্দের প্রয়োজনীয়তা এবং পরণে প্রয়োগ।

(৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা :—

আবৃত্তি, ঠেকা, টুকড়া।

দ্বিতীয়াংশ (তাল-বৈশিষ্ট্য) :—

(১) নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য :—

জাতি (ছয় প্রকার), প্রস্তার, আড়ি-লয়, কুআড়ী লয়, সোওয়াই লয় বিআড়ি লয়, অতি বিলম্বিত লয়, অমুদ্রুত, সাথসংগত, গৎ, পেশকার।

(২) ঠেকা, মাত্রা, ও বিভাগাদি সহ পাঠ্যক্রমভূক্ত তাল (শিখর, রুদ্র, যতিশেখর, চিত্রা, বসন্ত, ব্রহ্ম, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, গণেশ এবং মণিতাল) লিখন।

(৩) উপরিউক্ত তালগুলির তাললিপি লিখন।

(৪) আড়ি এবং কুআড়ী লয়ে তাল লিখনের পদ্ধতি।

(৫) ছয়গুণ এবং আটগুণে তাল লিখনের নিয়ম।

(৬) কর্ণাটকী সপ্ত তালের বিবরণ সহ তাদের জাতি এবং লিখন পদ্ধতি।

"তবলার ইতিবৃত্ত" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত:

কণ্ঠে মহারাজের শিষ্য ভারত-বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (বারাণসী) লিখেছেন: "তবলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম। প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকত্বে এবং তথ্যসমৃদ্ধিতে পুস্তকটি আদর্শস্থানীয়। বাংলা-ভাষায় তবলার ঔপপত্তিক আলোচনার যতগুলি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। তবলা শিক্ষার্থী এবং জিজ্ঞাসু সকলেই গ্রন্থটির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করি।"

*   *   *

গ্রন্থটি তবলা এবং তবলাবাদনের ইতিহাস। গ্রন্থকার প্রধানতঃ সংগীত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থে তেরটি অধ্যায়ে পাখোয়াজ ও তবলার পরিচয়, বর্ণ, লয়, অঙ্ক, তাললিপি, কতিপয় তবলাবাদকের জীবনী ও কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। তবলা সম্বন্ধে দু'একটি গ্রন্থ আগে প্রকাশিত হলেও ব্যাপক আলোচনা কমই হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার তবলা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত এবং সহজবোধ্য বিবরণ দিয়েছেন তা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সকলেরই চিত্তাকর্ষক হবে। গ্রন্থটি নিঃসংশয়ে সংগীতানুরাগী মহলে সমাদৃত হবে। দেশ, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৫০

*   *   *

......তবলা সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয়ই পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে এবং তার মধ্যে ঘরাণা ও বাজ, দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি, সর্বভারতীয় বিখ্যাত তবলা বাদকের জীবনী এবং সর্বোপরি রাবীন্দ্রিক তাল সহ ৬৬টি তালের পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রত্যেকটি আলোচনায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।" যুগান্তর ২২.১০.৫২.

"...অধ্যাপক ঘোষের "তবলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে তবলা সংক্রান্ত মোটা-মুটি সকল বিষয়ই স্থান পেয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা পরিমিত, তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত। বাংলা এবং ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তবলাবাদকের জীবনী পুস্তকটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করছে। তবলাজ্ঞানান্বেষীরা এই পুস্তকটির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। পুস্তকটির ছাপা এবং বাঁধাই বেশ পরিচ্ছন্ন।" অমৃত শুক্রবার, ১৭শে আশ্বিন, ১৩৫৯